উ প ন্যা স

কালিয়া মাসান

অভীক সরকার



ছবি- স্বপন চন্দ

খাতাটা ইনভিজিলেটরের হাতে তুলে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যে আশ্চর্য উল্লাসটা অনুভব করলাম তার তুলনা নেই। বাস রে বাস, এবারের অ্যানুয়াল এক্সামটা যেন শেষই হতে চাইছিল না।

আজ শেষ পেপার ছিল জিওগ্রাফির। খাতা জমা দিয়ে বাইরে এসে দেখি স্কুলের গেটের পাশের বুড়ো বটগাছটার নীচে সায়নী, অদ্রিজা, সায়ন্তন, কৌশিক, অতনু, এরা সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছে। আমাকে দেখেই হইহই করে উঠল সবাই।

আমিও চট করে গ্যাং-এ ঢুকে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় ব্যাগের মধ্যে খড়ড়ড় করে মোবাইলটা আওয়াজ করে উঠতে ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ফোনটা বার করলাম। দেখি পলি, মানে আমার বোনের ফোন। কলটা অ্যাক্সেপ্ট করে ফোনটা কানে ঠেকাতেই যেন একটা গ্রেনেড ফেটে পড়ল কানের কাছে, 'দাদা, এক্ষুনি বাড়ি চলে আয়, দীপুপিসি এসেছে।'

ব্যাস, আর কিছু বলার দরকার ছিল না। আড্ডা গেল চুলোয়, আমি প্রায় উড়ে গিয়ে রহমানকাকুর রিকশায় ল্যান্ড করলাম। দীপুপিসি এবার প্রায় বছর দুয়েক পর আমাদের বাড়িতে এলেন। মানে গল্পের পুরো খনি নিয়ে এসেছেন পিসি!

বাড়ি এসে দেখলাম যা ভেবেছিলাম তার প্রায় দেড়া কেস। দীপুপিসি এসেছে শুনে পাশের ব্লক থেকে মৌ, সন্দীপন, অরিজিৎ— এরা সবাই এসে হাজির। আমাদের দোতলা বাড়ির ওপরের ফ্লোরটা একদম গমগম করছে মানুষজনে। মা তো হেবি খুশি, কাউকে খাওয়াতে পারলে মা আর কিচ্ছুটি চায় না। লুচিভাজার গন্ধ পাচ্ছি, পাশের ঘর থেকে বাবা টেলিফোনে চাপা গলায় কাউকে চিকেন কষার অর্ডার দিচ্ছে শুনলাম। লোকজন, হৈ-হুল্লোড়, আড্ডা এসব আমার চিরকালই ফেভারিট। তার ওপর দীপুপিসি এসেছে মানে গল্পে-আড্ডায় আজকের দিনটা পুরো জমজমাট।

এখানে দীপুপিসির পুরো পরিচয়টা দিয়ে রাখি। পিসির পুরো নাম দীপান্বিতা সরখেল। উনি কিন্তু আমার নিজের পিসি নন, বাবার কলেজে পড়ার সময়কার জুনিয়র। মানে বাবা যখন ফাইনাল ইয়ারে পড়তেন, দীপুপিসি সেই বছরই কলেজে ভর্তি হন। সেই সূত্রে আমরা সবাই দীপুপিসি বলে ডাকি। বাবা অবশ্য ইকোনমিক্সের লোক, দীপুপিসি জিওলজির। তবে অন্য স্ট্রিমের হলে কী হবে, দীপুপিসিও অধীরদা বলতে অজ্ঞান, আর বাবাও দীপুপিসিকে খুবই স্নেহ করেন। আর আমার মা তো বলতে গেলে দীপুপিসির বুজম ফ্রেন্ড! আর তো আর, বেঁচে থাকা ইস্তক আমার দাদাই, যিনি নিজেও জিওলজির প্রফেসর ছিলেন, তাঁরও চোখ-মুখ দেখেছি দীপুপিসিকে দেখলেই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে, বলতেন, "শি ইজ মাই এল্ডার ডটার।"

অতএব এ-বাড়িতে মিস দীপান্বিতা সরখেলের প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে কারও মনে কোনও সংশয় থাকার কথা নয়। পিসির বয়েস বাবার থেকে দু'বছর কম, অর্থাৎ একচল্লিশ। পিসির হাইট পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চির বেশি নয়, আমার মতই রোগা টিংটিঙে চেহারা, আর বয়েজকাট চুল। জিনস টিশার্ট ছাড়া পিসিকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবে দীপুপিসিকে দেখলেই যেটা সবার আগে নজরে পড়ে সেটা হলো পিসির চোখদুটো। সবসময়ে কৌতুকে, ঔজ্জ্বল্যে, হাসিতে যেন হীরের টুকরোর মতো ঝকমক করছে। বাবার বক্তব্য অনুযায়ী, দীপুপিসিদের ব্যাচে অমন ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট আর ছিল না। দীপুপিসি অবশ্য নামও করেছেন খুব, বছর বিশেক ধরে দেশের বাইরেই থাকেন। এখন একটা অয়েল এক্সপ্লোরেশন কম্পানীর চিফ সায়েন্টিস্ট। যদিও পিসির বাংলায় কিন্তু এতদিন ধরে দেশের বাইরে থাকার কোনও ছাপই নেই। কথাবার্তা শুনলে মনে হয় উত্তর কলকাতার লোক, এক্ষুনি কলঘর থেকে নেয়ে এসে পান্তাভাত খেতে-খেতে পাড়ার পুপুদি-র সঙ্গে গপ্প করছে! পিসির আদত বাড়ি অবশ্য সাউথ কলকাতায়, বছরের দশমাস পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে, এই এপ্রিল-মে নাগাদ দুটো মাস কলকাতায় ভবানীপুরে নিজের প্রাচীন পৈতৃক বাড়িতে থাকতে আসেন। নেহাত পাগল ছাড়া এই গরমে কোনও এন আর আই কলকাতায় আসে বলে শুনিনি। পিসি কেন আসেন খোদায় মালুম! ভবানীপুরে ওই দুটো শরিকি ঘর ছাড়া সংসারপাতিও তো কিছু নেই কোথাও। এখানে এটা বলে রাখা ভালো যে দীপুপিসি বিয়েশাদিও করেননি।

আগেই বলেছি, পিসি জিওলজিস্ট। কাজের সূত্রে অনেক বিচিত্র জায়গায় যেতে হয়েছে। অভিজ্ঞতাও হয়েছে প্রচুর। তারই দু-একটা পিসি মাঝেমধ্যে কালোজিরে-রসুন-পেঁয়াজ-আদাবাটা-মির্চমশালা ইত্যাদি মাখিয়ে আমাদের শোনান। বাবা অবশ্য বলেন দীপুপিসি যা বলেন তার বেশিরভাগই গুল, পিসির উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। কিন্তু পিসির গল্প বলার কায়দা এমনই চমৎকার, আর গল্পগুলোও এমনই রোমহর্ষক যে একবার শুনলেই পরের গল্পটা শোনার জন্যে মনটা হাঁকুপাঁকু করে।

আমিও তো সেই গল্প শুনবার লোভেই এক-এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি টপকে দোতলায় এলুম। আর আসা মাত্রই আমাকে দেখে সবাই হইহই করে উঠলো। দীপুপিসি চ্যাঁচালেন সবচেয়ে বেশি, বাবাকে ডেকে বললেন, 'ও অধীরদা, ছেলে তো ম্যান হয়ে গেল গো! ক্লাস এইট হয়ে গেল, তার ওপর কচি করে গোঁফ অবধি গজিয়ে গেছে দেখছি। এবার আমার হাতে ছেড়ে দাও দেখি, আমার সঙ্গে একটু ঘুরে দুনিয়াটা দেখুক। কী বলিস রে লম্বকর্ণ?' আমি একটু লাজুক হেসে আর জবাব দেওয়ার জন্য দাঁড়াইনি, ব্যাগফ্যাগ রেখে দৌড়ে গিয়ে স্নান করতে ঢুকে পড়েছি।

স্নানটান সেরে, সবাই মিলে লুচি আর কষা মাংস দিয়ে লাঞ্চ করে যখন ড্রয়িংরুমে এলাম, তখন অত বড়ো ঘরটা পুরো লোকজনে গমগম করছে। লোক বলতে অবশ্য আমরা জনা পাঁচেক কুচোচিংড়ি আর বাবা। মা বলল যে এক্ষুনি মোক্ষদামাসিকে দিয়ে টেবিল পরিষ্কার করিয়ে নিজেও আসছে।

এদিকে আকাশ এসেছে কালো করে, জোরে হাওয়া দিতে শুরু করেছে। কালবৈশাখীর পূর্বাভাস আর কী! মা এসে বসতে না বসতেই চারপাশ অন্ধকার হয়ে এলো। বড় বড় ফোঁটায় শুরু হলো বৃষ্টি আর শোঁ শোঁ শব্দে প্রবল ঝড়ে উথালপাতাল করে উঠলো চারিদিক। সে কী ঝড়ের গর্জন, বাবা রে! মা এসে ঝটপট দরজা জানালা বন্ধ করে বলল, 'ও দীপুদি, একটা ভূতের গল্প বলো না, এই ওয়েদারে ভূতের গল্প দারুণ রকম জমবে কিন্তু।'

কথাটা শুনে ভুরু-টুরু কুঁচকে নাক উঁচু করে কী যেন ভাবলেন দীপুপিসি। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'দ্যাখ মণি, তুই তো জানিস, আমি ঘোর যুক্তিবাদী মানুষ। ভূতপ্রেত দত্যিদানো ডাইনি পিশাচ তাবিজ কবজ এ-সবে কোনওদিনই বিশ্বাস করিনি, আজও করি না। কিন্তু আজ থেকে বছর বিশ-বাইশ আগে সেবার পুরুলিয়াতে একটা ফিল্ডওয়ার্কে গিয়ে যা ভয়ানক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটাকে আর অন্য কিছু বলে উড়িয়ে দিতে পারিনি। গল্পটার পুরোটা আমিও প্রথমে বুঝিনি। পরে অবশ্য পিটার, মানে পিটার হেমব্রমের পারিবারিক গল্পগাছা কাহিনি শুনে সবটা জোড়াতালি দিয়ে পুরো কাঠামোটা দাঁড় করাবার চেষ্টা করি। তবুও অনেকগুলো খটকা মনের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে, বুঝলি।'

আমরা সবাই গা-ঘেঁষে বসলাম, দীপুপিসির গল্প শুরু হতে চলেছে।

*

'সেদিনও ছিল এমনই একটা ঝড়বৃষ্টির দিন, বুঝলি।' কোলবালিশটাকে কোলে জাপটে ধরে তার ওপর ভর দিয়ে বলতে শুরু করলেন দীপুপিসি, 'আমি তখনও কলেজে, ফাইনাল ইয়ার চলছে। তোরা তো জানিসই, আমার বাবার বদলির চাকরি ছিল, তখন বাবার পোস্টিং ছিল হাবড়াতে। হাবড়া বলতে আবার হাওড়া বুঝিসনি বাপু। বারাসাত পেরিয়ে তবে হাবড়া-অশোকনগর। এখন তো জায়গাটা পুরোদস্তুর শহর হয়ে উঠেছে, আমাদের ছোটবেলায় হাবড়া-অশোকনগর গাঁ-গেরাম ছিল বললেই চলে। তারই মধ্যে আমাদের কলোনিটাই ছিল যা একটু ভদ্রস্থগোছের। দূরে-দূরে ছড়ানো একতলা বাড়ি, প্রায় সব বাড়ির সামনে ফুলের কেয়ারি করা বাগান। আর বাড়ির পেছনে অনেকটা জায়গা জুড়ে বেড়া দিয়ে বাঁধা। তখন সবে টিভি এসেছে আমাদের ওদিকে। তাতে একটা মাত্র চ্যানেল, তা-ও বহু কষ্টে সন্ধেবেলায় কয়েক ঘণ্টার জন্যে দেখার পারমিশন পেতুম। এই তোদের মত নাকি, এখন তো দেখি কোটিখানেক চ্যানেল, যখনই টিভি খুলি, দেখি ভূতের নেত্য চলছে, হুঃ।

সে যাই হোক। পার্ট ওয়ান সবে শেষ হয়েছে, পুজো শেষ হলেও সেবার বর্ষা চলেছিলো আরও মাসখানেক। মাস দেড়েক বাদে আমাদের একটা ফিল্ড ওয়ার্ক আছে পুরুলিয়াতে, তারই প্রিপারেশন নিচ্ছি তখন। সে বছর তখনও ভালো করে শীত পড়েনি, তবে পড়বে পড়বে করছিল, বুঝলি। তবে পুরুলিয়া ফিল্ড ওয়ার্কের ডেট নভেম্বরের সেকেন্ড উইক নাগাদ। আবহাওয়া আপিস বলছিলো যে ততদিনে জাঁকিয়ে শীত পড়ে যাবে। সেই আশাতেই ছিলুম।

দিনটা ছিল খুব সম্ভবত শনিবার, তার ওপর অমাবস্যা। আমি আর আমার বান্ধবী মহুয়া গেছিলাম কলেজ স্ট্রিট, কিছু বই কিনতে। অধীরদা, তোমার মহুয়াকে মনে আছে কি?' শেষের প্রশ্নটা অবশ্য বাবার উদ্দেশে।

বাবা এতক্ষণ চুপচাপ বসে গল্প শুনছিল। নড়েচড়ে উঠে বসল এবারে, 'তোদের জিওলজির মহুয়া? খুব ভালো গান গাইতো যে মেয়েটা? যার বাবা ডাক্তার ছিলেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই মহুয়াই।' সায় দিলেন দীপুপিসি, 'ওর বাবা বিশ্বনাথ চৌধুরী আমাদের ওদিকে খুব পপুলার ডাক্তার ছিলেন। গ্রামের লোকে বলতো বিশ্বনাথ ডাক্তার সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি, মুখ দেখলে অর্ধেক অসুখ এমনিতেই সেরে যায়, ওষুধের খরচা বাঁচে! গরীবগুর্বো পেশেন্ট হলে বিশ্বনাথকাকুকে অনেকবার দেখেছি কম্পাউন্ডারকাকুকে ডেকে ফ্রি-তে ওষুধ দেওয়ার জন্যে বলে দিতে। এছাড়াও কতবার যে কতশত মরণাপন্ন রোগীকে বিশ্বনাথকাকু বাঁচিয়ে তুলেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। মহুয়াদের বাড়িতে আমাদের অবারিত দ্বার ছিলো, প্রায়ই যেতাম। কতবার দেখেছি সারা রাত ধরে কোনও রোগীর দেখাশোনা করে কাকু ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে বাড়ি ফিরছেন। সারা হাবড়া অশোকনগর জানতো যে বিশ্বনাথ ডাক্তারের ভিজিট ছিলো দু'টাকা, এবং সেটা না দিলেও ডাক্তারবাবু কিচ্ছুটি বলেন না! আমরা তো টাকার বদলে লাউ, কুমড়ো, এক বস্তা আলু, এসব নিয়েও গ্রামের লোকেদের উপস্থিত হতে দেখেছি। একবার তো একজন জ্যান্ত মুরগি নিয়ে এসে হাজির, সে নিয়ে আবার আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কী হাসাহাসি..."

এইখানে এসে এবার সন্দীপন ওরফে স্যান্ডি সামান্য কাশতে বাধ্য হলো। যার মানে হচ্ছে, 'পিসি, গাড়ি বেলাইন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, ফিরে এস, ফিরে এস।'

পিসি খানিকক্ষণ ভুরুটুরু কুঁচকে স্যাণ্ডির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মানতেই হবে ছোকরা বড়োই ডেয়ারডেভিল, কথা না বাড়িয়ে একটা সাদা পান (অল্প কিমাম আর চমন বাহার দিয়ে) বাড়িয়ে ধরলো পিসির দিকে। কারণ পুরো

সল্টলেক জানে যে দীপুপিসিকে ঠান্ডা করতে হলে বিজে মার্কেটের দুখনিয়া দুসাদের নিজের হাতে বানানো স্পেশাল পানের জুড়ি নেই। বছর তিনেক আগে দুখনিয়ার ছেলে বান্টিকে পিসি বলে কয়ে কোথাও একটা চাকরিতে ফিট করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে দুখনিয়া প্রবল ভক্তিভরে 'পিসিবাবা'র জন্যে পান বানায়।

সেই দেবভোগ্য পান মুখে দিয়ে পিসি যে কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হলেন সেটা পিসির মুখ দেখেই বোঝা গেল। খানিকক্ষণ খলরবলর করে পানটা চিবিয়ে পিসি বললেন, 'আহা, কলকাতা ছেড়ে গেলে একমাত্র এই লাক্সারিটাই আমি মিস করি খুব, বুইলি! তাপ্পর শোন।

'মহুয়ার ভাই ছিলো দীপাঞ্জন, লম্বামত দোহারা চেহারা, খুব ভালো ফুটবল খেলত। পড়াশুনোতেও তুখোড় ছিল ছোকরা, পরে জয়েন্ট দিয়ে শিবপুরে মেকানিকালে চান্স পায়। সে যাই হোক, বিশ্বনাথকাকুরা অনেক দিন থেকেই ওখানকার বাসিন্দা। সম্পন্ন বনেদী ফ্যামিলি, সে এলাকায় চৌধুরীদের বাড়ি বলতে লোকে একডাকে চিনতো। সে বাড়ির বয়েস তখনই একশোর ওপরে, ওদের এক পূর্বপুরুষের তৈরি। পরে শুনেছিলাম সেই ভদ্রলোক নাকি ঝাড়খণ্ডের নাগবংশী শাহদেও রাজাদের নায়েব ছিলেন। তখন অবশ্য ঝাড়খণ্ড হয়নি, বিহারের অংশ ছিল জায়গাটা। রাজারা যে ওঁকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন সে কথা বলাই বাহুল্য। কথিত আছে যে ঝাড়খণ্ডের রাতুতে শাহদেওদের যে রয়্যাল প্যালেসটা আছে, সেটা নাকি তাঁরই তত্ত্বাবধানে তৈরি, সে হবেও বা। আমাদের গল্পটা আসলে মহুয়াকে নিয়েই, তাই ওদের ব্যাপারে একটু বিশদে বলে নিলাম।

সে যাই হোক। আমরা তো কলেজ স্ট্রিট ঘুরে, কফি হাউসে বন্ধুদের সঙ্গে দেদার আড্ডায় মজে আছি, কফি হাউস প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে অথচ আমাদের যে বাড়ি যেতে হবে সে-কথা খেয়ালই নেই। হঠাৎ হুঁশ ফিরল মহুয়ার, কথা বলতে-বলতে একবার ঘড়িটা দেখে ধড়ফড় করে উঠে পড়ে বলল, 'অ্যাই দীপু, আটটা প্রায় বাজে যে, বাড়ি যাবি না?'

নীচে নেমে দেখি শীতের রাতে কলেজ স্ট্রিট প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে, প্রায় সব দোকানের ঝাঁপই বন্ধ। টিমটিম করে কয়েকটা ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলছে। আমরা তো লম্বা-লম্বা পা ফেলে মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে এসে হাজির। ও মা, এসে দেখি চারিদিক শুনশান, কোথাও কিচ্ছুটি নেই! না একটা বাস, না ট্রাম, না রিকশা না কিচ্ছু। অত বড়ো রাস্তাটার দু'দিকে দৃষ্টিসীমার শেষ অবধি জনমনিষ্যি তো দূর, এমনকি পশুপ্রাণী অবধি নেই! দেখে ভারি আশ্চর্য লাগল, কলকাতা শহরের বুকে সাড়ে আটটা এমন কিছু রাত না, আরেকটু উজিয়ে গেলেই ধর্মতলা আর পার্ক স্ট্রিট, যেখানে হয়তো সন্ধে সবে শুরু হয়েছে। তবে এখানে এমন শুনশান কবরস্থান-মার্কা অবস্থা কেন?

উত্তরটা পেলুম একটা ঠান্ডা জোলো হাওয়া গায়ে ঝাপটা মারতে। মাথা তুলে ওপরে তাকিয়ে দেখি আকাশটা কালো সীসের মতো ভারী হয়ে আছে, ঝড়বৃষ্টি নামল বলে। তাই রাস্তাঘাট এত ফাঁকা, এইবার বুঝলাম। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে শিয়ালদহ যাব কী করে? রাস্তা বেশিদূরের নয়, কিন্তু সঙ্গে গাদাখানেক বইপত্তর আছে যে! অত ভারী-ভারী বই নিয়ে এতটা হাঁটতে হবে ভেবেই যেন জ্বর এল গায়ে!

এমন সময় হঠাৎ দেখি একটা হাতে টানা রিকশা টুংটাং করতে-করতে কলেজ স্ট্রিটের মোড়ের দিক থেকে শিয়ালদা-র দিকে যাচ্ছে। দেখে খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু...'

এতটা বলেই পিসি চুপ করে গেলেন। স্যান্ডি একবার গলা খাঁকারি দিয়ে শুকনো গলায় বললো, 'কিন্তু কী পিসি?'

পিসি ভুরু কুঁচকে কী যেন একটা ভাবছিলেন। তারপর অন্যমনস্ক গলায় বললো, "আমি এখনও মাঝেমাঝে ভাবি সেদিন ঠিক কী দেখেছিলাম। চোখের ভুল? উঁহু, মা বলত আমার নাকি শকুনের চোখ, এখনও চশমা ছাড়াই বহুদূর অবধি স্পষ্ট দেখতে পাই। তখন অল্পবয়সে অত ভুল দেখব? কী জানি?'

বলে আমাদের দিকে তাকালেন একবার, তারপর ফের শুরু করলেন, 'কী দেখলাম জানিস? লোকটাকে দেখে আমার চকিতের জন্যে একবার মনে হল যে লোকটা যেন হঠাৎ করে আবির্ভূত হল। কথাটা আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতো পারব কি না জানি না, তবুও চেষ্টা করছি, বুঝলি? মানে ধর বাঁ-দিকটা পুরো ফাঁকা, দূরে-দূরে এক-একটা ল্যাম্পপোস্টের আলো টিমটিম করে জ্বলছে, তাদের আলোগুলো রাস্তার ওপরে সার্কেল তৈরি করেছে। দুটো আলোর সার্কেলের মাঝে-মাঝে বেশ খানিকটা করে অন্ধকার। আমি ওদিকেই তাকিয়ে ছিলাম, সামনে পুরো ফাঁকা রাস্তা। মহুয়া কী একটা বলছিল সেটা শোনার জন্যে ঘাড়টা ডানদিকে একবার ঘুরিয়েই ফের বাঁ-দিকে তাকালাম। তখনই মনে হল যেন একটু দূরের দুটো ল্যাম্পপোস্টের মাঝখানের সেই অন্ধকার জায়গাটা থেকে হঠাৎ করে রিকশাওয়ালাটা বেরিয়ে এল। আমি তো অবাক! তারপর ভাবলাম সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি গেছে, বেজায় ক্লান্ত লাগছে, তাই হয়তো চোখে ভুলভাল দেখছি।

সে যা-ই হোক, মহুয়া তো লাফিয়ে উঠেছে রিকশাওয়ালাকে দেখে। ও চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই রিকশা, শিয়ালদা যায়েগা?' শুনে রিকশাওয়ালাটা ধীরেসুস্থে রিকশা থামাল, তারপর ডানদিকে মাথাটা ঘুরিয়ে একটা অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে গলায় বললো, 'যায়েগা দিদি, জরুর যায়েগা।'

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ আমার গা'টা কেমন যেন শিউরে উঠলো। স্লেটে কখনও কাউকে লম্বা নখ দিয়ে আঁচড় কাটতে শুনেছিস? অবিকল সেই শব্দ। টিমটিমে আলোয়, বৃষ্টির হাওয়া ভেজা জনমানবহীন সেই শীতের সন্ধ্যায় সামান্য খোনা গলায় বলা চারটে শব্দ শুনে যেন আমার বুকের রক্তটা জমাট বেঁধে গেল। মনে হল এই বিশ্বচরাচরে আর কিছু নেই, কেউ কোথাও নেই, শুধু

এই খোনা গলার একটা একটানা বিরতিহীন কান্না, মরা মানুষের হাতের নখের মতো এই ফাঁকা জনবিরল পরিবেশের ওপরে আঁচড় কেটে যাচ্ছে!"

এইখানে দীপুপিসি একবার ফের থামলেন। এতটা শুনেই আমার গলার কাছটা ঘেমে উঠেছিল। আড়চোখে মৌ-এর দিকে তাকালাম, মেয়েটা যা বড় হাঁ করে আছে, তাতে ও এখন স্বচ্ছন্দে একটা বিগ ম্যাক কামড়াতে পারে! পাশের টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে একঢোঁক জল খেয়ে পিসি শুরু করলেন,

'মহুয়ার অবশ্য সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, 'কীরে দীপু, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, চল চল... দেরি হয়ে যাচ্ছে যে!' বলে আমাকে প্রায় টানতে-টানতে রিকশার দিয়ে নিয়ে চলল। রাস্তাটা ক্রস করছি, আমার চোখ লোকটার দিকে, আর খেয়াল করছি যে লোকটা এক দৃষ্টিতে মহুয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। আর এমন তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে, আমি যে ওকে দেখছি সে দিকে ওর কোনও নজরই নেই।

আরও কাছে আসতে লোকটাকে আরও লক্ষ করলাম। লোকটার কোঁকড়ানো চুল, চ্যাপ্টা নাক আর ঘোর কালো গায়ের রঙ দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে লোকটা সাঁওতাল বা অন্য কোনও আদিবাসী মানুষ। কলকাতার রাস্তায় আজ অবধি যত রিকশাওয়ালা দেখেছি তারা সব্বাই বিহারী, আজ অবধি কোনও ট্রাইবাল মানুষকে এ-কাজ করতে দেখিনি। ওখান থেকেই আমার খটকা লাগা শুরু। লোকটার গা খালি, কেবল একটা খাটো নোংরা ময়লা ধুতি মতো পরে আছে। তবে এসব ছাড়া প্রথমেই যেটা নজরে আসে সেটা হচ্ছে লোকটার চোখ দুটো। এত জীবন্ত আর লাল সেই চোখদুটো যে চট করে দেখলে মনে হয় চোখের মাঝখানে যেন লাল টকটকে জ্বলন্ত কয়লা বসানো আছে। মনে হয় ওই হাড়জিরজিরে লোকটার বুকের ভেতরে যা কিছু আছে তার সবটা একসঙ্গে বেটে নিংড়ে ওই চোখদুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। বাপ রে, সে কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! তার সঙ্গে ধকধক করে জ্বলতে থাকা চোখদুটোর মধ্যে একটা চাপা উল্লাসের ছোঁয়া। যেন অনেকদিনের বন্দি আত্মা বহুদিন বাদে তার শাপমুক্তির খোঁজ পেয়েছে! তার রাগ আর আনন্দ দুটোই যেন আর বাঁধ মানতে চাইছে না!

লোকটাকে দেখেই তাই আমার একটা অস্বস্তি হওয়া শুরু হলো। তোরা তো জানিস, ভয়ডর জিনিসটা ছোটোবেলা থেকেই আমার কম, তবুও অস্বস্তিটা এড়াতে পারছিলাম না। শুধু কাছে আসতে খেয়াল করলাম লোকটার বুকের বাঁ-দিকের একটু ওপরে, কণ্ঠার একটু নীচে একটা গভীর কাটা দাগ। মহুয়ার অবশ্য অতশত খেয়াল নেই। সে প্রায় লাফিয়ে উঠল রিকশায়, আমাকেও হাত ধরে টেনে তুলল। তারপর টুংটুং করতে-করতে রিকশাটা রওনা দিল শিয়ালদা-র দিকে।

সেই রাতটার কথা ভোলা খুব মুশকিল, বুঝলি! এখনও চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই। একদম ফাঁকা নির্জন রাস্তা, একটা কুকুর অবধি নেই। কলকাতা শহরের কোনও রাস্তা যে রাত আটটা ন'টার সময়ে অত জনমানবহীন হতে পারে সেটা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। থেকে-থেকে মেঘের চাপা গুরুগুরু গর্জন, ঝলকে-ঝলকে বয়ে আসা ঠান্ডা হাওয়া আর এরই মধ্যে আধা-আলো আধা-অন্ধকারের মধ্যে রিকশায় চড়ে আমরা দুই বন্ধু যাচ্ছি শিয়ালদা-র দিকে।

হাওয়ার সঙ্গে কিছু ধুলো আর গাছের পাতাফাতাও আমাদের গায়ে এসে পড়ছিল বটে, তবে খানিকক্ষণ যাওয়ার পর খেয়াল করলাম যে আরও একটা জিনিস আমাদের গায়ে উড়ে এসে পড়ছে বারবার।

ছাই!

মানে কাগজ পোড়ানো ছাই না। খুব ভালো করে কাঠ পুড়ে গেলে যে সাদা-কালোয় মেশানো ছাই উড়ে বেড়ায়, সেই ছাই। অল্প-অল্প করে সেই সূক্ষ্ম ছাইয়ের কণা উড়ে আসছে আমাদের দিকে। ধুলোয়, আর সেই ধূসর রঙের ছাইয়ে আস্তে-আস্তে আমাদের সালোয়ার আর হাত মুখ ভরে যাচ্ছে। সামনে তাকালে দেখতে পাচ্ছি যে রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সেই হলদেটে আলোর মধ্যে থেকে ছোট্টছোট্ট ছাইয়ের কণা উড়ে আসছে আমাদের দিকে।

এত ছাই কোথা থেকে এল? ভালো করে খোঁজ করতে গিয়ে প্রথমে বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকার পর ধরতে পারলাম, এবং সে ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য, ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়!'

আমাদের সবার গলা শুকিয়ে গেছিল। অরিজিৎ ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বললো, 'কেন পিসি?'

ফিসফিস স্বরে পিসি বললেন, 'কী দেখলাম জানিস? সেই ছাইগুলো উড়ে আসছে লোকটার গা থেকে! মানে সেই বাদলা হাওয়ার মধ্যে দিয়ে লোকটা রিকশা হাতে প্রায় উড়ে চলেছে, আর তার গা থেকে যেন হঠাৎ করেই জন্ম নিচ্ছে সেই ছাইয়ের দল, আর ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে।

ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য লেগেছিলো আমার কাছে, যে তোদের বলে বোঝাতে পারব না। অথচ নিজের চোখের সামনে ঘটছে ব্যাপারটা, 'ও কিছু নয়' বলে উড়িয়ে দিতেও পারছি না! কী করব সেটা ভাবতে-ভাবতেই দেখি ততক্ষণে বৈঠকখানা বাজারের কাছাকাছি এসে গেছি। একটু দূরে দেখতে পাচ্ছি দোকানের আলো, লোকজনের চলাফেরা। দেখে বুকে বেশ কিছুটা বল এল। আর ঠিক সেই সময়েই পথের ধারে সাইড করে রিকশার হ্যান্ডেলটা নীচে নামিয়ে রাখল লোকটা।

মহুয়া তো অবাক! ও বলল, 'সে কী? আর যাবে না?'

সেই স্লেটের ওপর আঁচড় কাটার মতো ক্যারক্যারে গলায় জবাব এল, 'নেহি।'

মহুয়া তর্ক করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার এই লোকটার সঙ্গ আর একটুও পছন্দ হচ্ছিল না। আমি বললাম, 'ছাড় না

মৌ, টাকা দে আর চল। এসেই তো গেছি।' বলে রিকশা থেকে নেমে একটা পাঁচ টাকার নোট সিটের ওপর প্রায় ছুড়ে দিয়েই আমরা ঘুরে দাঁড়ালাম হাঁটা লাগাবো বলে।

আর ঠিক সেই সময়ে লোকটা সেই ঘাড়ের রোম খাড়া করে দেওয়া গলায় ফিসফিস করে শুধু দু'বার বলল, 'কালিয়া মাসান, কালিয়া মাসান।'

মহুয়াই থমকাল প্রথমে। 'কী বললে?' বলে ঘাড়টা ঘুরিয়েই ও অবাক স্বরে বললো, 'এ কী! লোকটা গেল কোথায়?'

আমি আর দাঁড়াইনি, শক্ত করে মহুয়ার হাতটা চেপে ধরে দ্রুত হাঁটা লাগিয়েছিলাম স্টেশনের দিকে।

এখন আফশোস হয়, তখন যদি একটু সতর্ক হতাম, মহুয়াকে অত বড় বিপদের মধ্যে পড়তেই হতো না কোনওদিন। অবশ্য আমারও হয়তো ভৈরবীমায়ের সঙ্গে দেখাটা কোনওদিন হতো না।"

*

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে রাতের অন্ধকারে লোকটা যখন গামছাতে মাথা অবধি মুড়িয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লয়েডের বাংলোয় এল তখন চারিদিন শুনশান। ব্রিগেডিয়ার লয়েড তখন ডিনার সেরে দামী মুর্শিদাবাদী সিল্কের গাউন পরে অত্যন্ত বিরক্তমুখে চুরুট খাচ্ছিলেন। ইন্ডিয়ার মনসুন কোনওদিনই ওঁর পছন্দ নয়, নেহাত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভালো পয়সা দিচ্ছে তাই এই গড ফরসেকেন কান্ট্রিতে থাকতে আসা। তার ওপর সারাদিন ধরে এই এক ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টিতে তাঁর মেজাজ টঙে চড়ে ছিল। নইলে কোথায় স্কটিশ হাইল্যান্ড, আর কোথায় এই রাজমহলের জঙ্গল। বিরক্তি আর রাগে গরগর করছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ সমরনায়ক জেনারেল লয়েড।

এমন সময় খাস খানসামা মুনাব্বর খাঁ এসে এত্তেলা দিল, 'চওধরী সা'ব আয়ে হ্যাঁয়।'

হাত নেড়ে দর্শনপ্রার্থী লোকটিকে তাঁর খেদমতে পেশ করতে বললেন জেনারেল লয়েড, তারপর নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন।

আবহাওয়া ভালো না, একদমই ভালো না। ভাগলপুর থেকে শুরু করে বীরভূম, বস্তার থেকে রাজমহল, পুরো ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকাটাই যেন এখন আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছে। এই এলাকা সাঁওতালদের এলাকা, তাদের মধ্যে বিদ্রোহের চাপা আঁচ ধিকিধিকি জ্বলতে জ্বলতে আজ ভিসুভিয়াস হয়ে ফেটে পড়ার উপক্রম। চারিদিকে বারুদের গন্ধ, বিদ্রোহের ধ্বনি। এই জঙ্গলের হাওয়ায়-হাওয়ায়, পাতায়-পাতায় কান পাতলে শোনা যাচ্ছে রক্তমাতাল সেই ডাক।

হুল। হুল জোহার।

কোম্পানির পোষা গুপ্তচরেরা এই ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত হওয়ার মত রিপোর্ট পাঠাচ্ছে বারবার। সে-সব ব্যাপারে বিশদে খবরাখবর জানতেই আজ এই গোপন রঁদেভু-র আয়োজন।

বেঁটেখাটো চেহারার লোকটা ঘরে ঢুকেই আভূমি প্রণত হয়ে সেলাম ঠুকলো, 'সেলাম সাহিব।'

লোকটাকে একদম পছন্দ করেন না জেনারেল লয়েড, টাকার জন্যে যারা স্বদেশবাসীর সঙ্গে বেইমানি করে তাদের পছন্দ করার কথাও না। কিন্তু লোকটা ক্ষমতাশালী, তার ওপর এই এলাকার নেটিভ সাঁওতালদের অনেক খবরাখবরও রাখে। নেহাত বাধ্য হয়েই লোকটাকে প্রশ্রয় দেন তিনি। ইচ্ছে আছে যে এইসব ঝামেলা শেষ হলে একদিন কোনও একটা ছুতোনাতায় লোকটাকে ধরে কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেবেন তিনি। তবে তিনি ঝানু সমরবিদ, মনের মধ্যে ঝড় বয়ে চললেও মুখে প্রকাশ পাওয়া দুষ্কর। দিব্যি সভ্য-ভব্য ভাবে আপ্যায়ন করলেন এই নিশিরাতের অতিথিকে, চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে মধুর হাসিতে ভুবন ভরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওয়েল বাবু, এত রাতে এসেছ যখন, কোনও ইম্পর্ট্যান্ট খবর নিয়েই এসেছ নিশ্চয়। কী সেই খবর বাবু? টেল মি।'

'অবস্থা খুব খারাপ সাহেব, হাওয়া খুবই গরম। যে কোনওদিন এই সাঁওতালরা আমাদের, মানে বাঙালি জমিদার, নায়েব, মহাজনদের ওপর চড়াও হতে পারে। এই এলাকার সব মাড়োয়াড়ি আর বাঙালি মহাজনেরা আমাকে ধরে বসেছে আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। হুজুর আমাদের মাই বাপ, কিছু তো নিশ্চয়ই করবেন।'

'কিন্তু হঠাৎ এরা এরকম ক্ষেপে গেল কেন বাবু? কিছু তো কারণ আছেই?'

'কারণ তো আপনারাই সাহেব।'

জেনারেল লয়েডের মুহূর্তের জন্যে মনে হল তাঁর বন্দুকটা এনে লোকটাকে এখানেই নিকেশ করে দেন। সাহস দেখো এই বজ্জাত বাঙালিটার, তাঁরই সামনে বসে তাঁদেরই দোষারোপ করছে? মনের রাগ মনেই চেপে রাখলেন তিনি, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন 'হোয়াই বাবু, এরকম বলছ কেন?'

খিক-খিক হাসলেন চওধরী সা'ব, এই হাসিটা শুনলেই জেনারেল লয়েডের গা জ্বলে যায়, তিনি অপলক চোখে সামনে তাকিয়ে রইলেন।

'সে কী সাহেব, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা এ-দেশে কারা চালু করেছিল? আপনারা নন?'

বাঘাটে চোখে চেয়ে থেকে একটা হুঙ্কার ছাড়লেন জেনারেল লয়েড, 'তো?'

খিক-খিক করে ফের সেই গা-জ্বালানো হাসি, 'তা সাহেব এই-সব জায়গাজমি যখন একধার থেকে বাইরের লোকের হাতে তুলে দিলেন, একবারও ভেবেছিলেন, এই সাঁওতালরা জমির খাজনা দেবে কী করে?'

'বাকিরা যা করে দেয়, পুরো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি যে ভাবে দেয়, সেভাবেই দেবে।' জেনারেল লয়েডের স্বরে বিরক্তি আর উষ্মা গোপন থাকছিল না।

লোকটার হাসি এবার সহবতের বাঁধ ভেঙে দেয়, 'ওখানেই তো ভুলটা করেছেন সাহেব। আপনারা দেখেননি যে এই সাঁওতালদের মধ্যে টাকা পয়সার ব্যাপারটাই নেই, জিনিসের বদলে জিনিস কেনে? অথচ খাজনা দিতে হয় টাকায়, তাই না?'

কিছু বললেন না জেনারেল লয়েড। স্থির চোখে চেয়ে রইলেন।

একটু নীচু হয়ে ফিসফিসিয়ে বললো লোকটা, 'কখনও ভেবেছেন সাহেব, এরা টাকা কোথায় পাবে?'

বক্তব্যটা আস্তে-আস্তে প্রণিধান করছিলেন লয়েড। তিনি কিছু বললেন না, শুধু গম্ভীর মুখে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন।

লোকটার স্বরে এবার আর বেয়াদবির আভাস আটকানো গেল না, 'এবার বলুন দেখি সাহেব, সেই টাকা দিতে কারা এল?' ফের সেই ধূর্ত শিয়ালের মতো হাসি, 'আমরা এলাম, আমরা। লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকেরা।'

'তারপর?' চিন্তিত শোনায় জেনারেল লয়েডের গলাটা।

খিক-খিক হাসিটাকে বরদাস্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবার, 'তারপর? তারপর আর কী? আমরা এসেই দেখলাম যে ব্যাটাচ্ছেলেগুলো পড়াশোনা দূরে থাক, গুনতে অবধি শেখেনি! ক'পয়সায় একমণ ধান হয় সেটা অবধি জানে না!'

ব্যাপারটা এবার উপলব্ধি হল লয়েডের। তিনি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন।

'তারপর কী সেটা জিজ্ঞেস করবেন নাকি সাহেব? আপনি পারেনও বটে! বলি এইসব অসভ্য সাঁওতালগুলো লেখাপড়া জানে নাকি যে হিসেব-নিকেশে আমাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে? তাছাড়া এই বুনোগুলো না থাকলে চাষ-আবাদ করবে কে এই এলাকায়, আর জঙ্গল কেটে বসতিই বা বসাবে কারা? তবে শক্ত লোক বটে এরা, যেমন কড়া জান, তেমনই গায়ে শক্তি, শুধু দু'বেলা দুটো খেতে দিতে হয় এই যা। ভুলিয়ে-ভালিয়ে একবার ফাঁদে ফেলার ওয়াস্তা। ব্যাস। তারপর বাপ, ছেলে; তার ছেলে, এইভাবেই খাটিয়ে নিয়ে যাও, সস্তায় এমন মুনিষ আর কোথাও পাবেন না সাহেব, এই লিখে দিলাম।'

'বন্ডেড স্লেভস!' অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন জেনারেল লয়েড।

আবার সেই খিক-খিক হাসি, 'তবে বলতে নেই সাহেব, এই আপনাদের দৌলতেই কিন্তু আমাদের হাতে দু'পয়সা আসছে বেশ। ব্যাটারা এক্কেবারে গোমুখ্যু, হিসেবনিকেশ কিছুই বোঝে না। মাথায় হাত বুলিয়ে এটা-ওটা হাতিয়ে নিতে কোনও কষ্টই নেই। ঠাকুরের দয়ায় দেশ-গাঁয়ে বেশ কয়েক বিঘে জমি আর পাকা একটা ভদ্রাসন বানিয়েছি। রাজারা যেদিন কর্ম থেকে অব্যাহতি দেবেন, দেশে ফিরে একেবারে জমিয়ে বসবো ভাবছি।'

রাগে গা-টা রি-রি করছিলো জেনারেল লয়েডের, 'কিন্তু এরা তোমাদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করে না কেন?' গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন তিনি।

লোকটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে, তারপর কোথাও কিচ্ছু নেই হো-হো করে বিপুল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। চোয়াল শক্ত করে সেদিকে চেয়ে রইলেন প্রবীণ সেনাপ্রধান। তারপর বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে চোখের জল মুছেটুছে সুস্থির হলো লোকটা, 'উফ, হাসিয়ে প্রায় মেরে ফেলছিলেন সাহেব। দোহাই, অমন রসিকতা আর করবেন না, পায়ে পড়ি আপনার। উফ, বাপ রে, আরেকটু হলে পেট ফেটে যাচ্ছিল। বলি সাহেব, আপনাদের ম্যাজিস্টর সাহেব বসেন কোথায়? আদালতটা কোথায়? হুইইই ভাগলপুর। বলি কখনও ভেবেছেন এখান থেকে অদ্দূর যাবে কী করে ব্যাটারা? গেলেও বা, মুনশি, পেশকার, মুনিম এ-সব সামলে-সুমলে হাকিমের সামনের দাঁড়িয়ে মনের কথা গুছিয়ে বলবেই বা কী করে? এ-সব কোনওদিন ভেবে দেখেছেন সাহেব?- এখন জিজ্ঞেস করছেন ওরা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যায় না কেন? উফ, কী প্রশ্নই না করলেন সাহেব। হাসতে-হাসতে মরেই যাচ্ছিলাম প্রায়...' লোকটার সেই বিশ্রী খিকখিক হাসি শেষই হতে চায় না আর!

সরু চোখে এই বেয়াদবিটা দেখছিলেন লয়েড। তাঁর ধৈর্য প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে তখন। দাঁতে-দাঁত ঘষে নিলেন একবার, তারপর হিমশীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'এইসব বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথায় এস বাবু। বারুদের স্তূপে আগুনটা লাগাচ্ছে কে বা কারা সেটার ব্যাপারে কিছু বলবে?'

এইবার সাপের মত চাউনি দিয়ে সামনে তাকাল লোকটা। অসমসাহসী জেনারেল লয়েডেরও বুকটা একবার কেঁপে উঠলো সেই চাউনির সামনে। মনে হল একটা ধূর্ত গোখরো যেন সহসা ফণা তুলে দাঁড়ালো তাঁর সামনে।

প্রায় সাপের মতোই হিসহিসে গলায় বললো লোকটা, 'এই পাকুড় থেকে সাড়ে আঠাশ ক্রোশ উত্তরে ভোগনাডি বলে একটা গ্রাম আছে, তার নাম শুনেছেন সাহেব?'

এদেশে লক্ষ-লক্ষ গ্রাম আছে, এই রাজমহলেই আছে কয়েকশো। সব গ্রামের নাম জানা লয়েডের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি চুপ করে রইলেন।

'সেই গ্রামের বাসিন্দা চুলু সাঁওতালের চার ছেলে, দুই মেয়ে। ওরা জাতে মুর্মু, সাঁওতালদের ঠাকুর আর বোঙাদের পুজো করাই ওদের কাজ। কয়েক মাস আগে পুরো রাজমহল এলাকায় দাবানলের মতো একটা খবর ছড়ায়। খবরটা এই যে, ঠাকুর নিজে এসে নাকি ওদের বড় দুই ছেলেকে দর্শন দিয়েছেন। বলেছেন এই দিকু জমিদার, ব্যবসায়ী আর মহাজনদের খেদিয়ে দিয়ে সাঁওতালদের নিজের দেশ প্রতিষ্ঠা করতে। দামিন-ই-কোহ নামটা শুনেছেন সাহেব?'

'না।' জেনারেল লয়েডের মুখটা ক্রমেই থমথমে হয়ে উঠছিল।

'ওটার মানে হল সাঁওতালদের নিজের দেশ। যত মাঝি,

জগমাঝি আর পারাণিক আছে তারা সবাই শালগাছের ডাল নিয়ে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলছে এই দেশ, এই জঙ্গল, এই পরগণা সাঁওতালদের, ওঁরাওদের, মুণ্ডাদের, এই সম্পদে বাইরের কারও কোনও অধিকার নেই। বলছে অন্যায় ভাবে জারি করা খাজনা আর ধার নেওয়া টাকার ওপর সুদ দেবে না ওরা।'

সুদ দেবে না? জঙ্গল আর জমিন ওদের? মানে খাজনাও দেবে না? এইবার সোজা হয়ে বসলেন জেনারেল লয়েড। এসবের মানে হচ্ছে যে জমিন্দারবাবুদের হাতে টাকা আসবে না, অর্থাৎ জমিন্দারদের ক্ষতি। আর এ-কথা কে না জানে যে জমিন্দারদের ক্ষতি মানে কোম্পানির ক্ষতি? তিনি কোম্পানির বেতনভুক ভৃত্য হয়ে এই কাজ হতে দিতে পারেন কি? অবশ্যই না, কিছুতেই না!

লোকটার ফিসফিসানি আরও গাঢ় হয়ে আসে, 'কয়েকদিন পরেই পাঁচখেতিয়াতে ওদের একটা খুব বড়ো জমায়েত হবে সাহেব। সেখান থেকে ওরা নাকি কলকাতা যাবে দরবার করতে। হাজারে-হাজারে ওরা জড়ো হচ্ছে, যে কোনওদিন আগুন জ্বলে যেতে পারে সাহেব।'

ট্রাইবালসগুলো কলকাতা অবধি যেতে পারে শুনেই জেনারেল লয়েডের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল। লর্ড ডালহৌসি কড়া ধাঁচের মানুষ, এদিককার গণ্ডগোলের আঁচ বিন্দুমাত্র ওদিকে পড়লে লয়েডের পরের পোস্টিং আফ্রিকাতে হওয়াও বিচিত্র নয়। তাছাড়া এই এলাকায় রেল লাইন পাতার কাজও চলছে, এর ওপর গভর্নর জেনারেল নিজেও কড়া নজর রেখেছেন। সে বিষয়েও যে কোনওরকম শৈথিল্য বরদাস্ত করা হবে না সেটাও উনি ভালো করেই জানেন।

এই আগুন ভালো করে জ্বলে ওঠার আগেই নেভাতে হবে, যে কোনও মূল্যে!

লোকটার সামনে ঝুঁকে এলেন তিনি, 'হুমম। তা তুমি আমাদের জন্যে কী-কী করতে পার বাবু?'

ধূর্ত কুটিল চোখে চেয়ে রইল লোকটা, তারপর খিক করে হেসে বলল, 'কোম্পানি আমার জন্যে কী-কী করতে পারে আগে সেইটে বলুন দিকি সাহেব।'

'ওই চারটে ভাইকে ধরিয়ে দিতে পারবে?' সোজা কথা সোজাই বলেন জেনারেল লয়েড। ওটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

'তার বদলে?' হিসহিস করে উঠলো লোকটার স্বর।

'প্রত্যেক ভাইয়ের জন্যে দশ হাজার রুপেয়া ইনাম। ডেড অর অ্যালাইভ, চারটেকেই চাই।'

টাকার কথা শুনে চোখদুটো যেন ধক করে উঠল লোকটার, 'হয়ে যাবে সাহেব। তবে ছোট দুটোকে ধরে লাভ নেই। পালের গোদা হচ্ছে বড়ো দুটো, ও দুটোকে ধরলেই চল্লিশ হাজার আমার চাই সাহেব, সে ব্যবস্থা করে দিতে হবে কিন্তু।'

'আর দে সো স্পেশ্যাল?'

'কী বলছেন কী সাহেব? ওদের চেনেন আপনি? ওদের একডাকে হাজারে-হাজারে সাঁওতাল এককাট্টা হচ্ছে, বুকের রক্ত দিতে রাজি হচ্ছে, বুঝতে পারছেন না ওদের শক্তি? আমি ওদের চিনি সাহেব, ছেলেদুটোর যেমন সাহস তেমন শক্তি। ওই দুই ভাই যতক্ষণ বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, জেনে রাখুন সাহেব, একটাও সাঁওতাল লড়াইয়ের ময়দান ছাড়বে না। ও-দুটো সাচ্চা মরদ সাহেব, একেবারে বাঘের বাচ্চা।'

'পারবে তো বাবু? নাকি আমাদের অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে?'

ফের সেই খিক-খিক হাসি, 'হরনাথ চৌধুরী মিথ্যে আশ্বাস দেয় না সাহেব। বলেছি যখন, কাজ হয়ে যাবে। তবে সময় লাগবে সাহেব, খুব সতর্ক হয়ে এগোতে হবে। আপনি আপনার সেপাইদের জোগাড় করুন, কারণ লড়াইটা কিন্তু আটকানো যাবে না। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের ব্যবস্থা করছি।'

উঠে পড়লেন কুশলী সমরবিশেষজ্ঞ জেনারেল লয়েড, কালই ক্যাপ্টেন শেরউইলকে ডেকে নিতে হবে। সাত নম্বর আর চল্লিশ নম্বর নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টকেই তলব করলে চলবে আপাতত। অনেক কাজ সামনে।

দেখাদেখি লোকটাও উঠে পড়েছিলো। সেলাম ঠুকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় কী একটা মনে পড়াতে ঘুরে দাঁড়ালেন লয়েড, বললেন, 'আরে, ওই চুলু সাঁওতালের ছেলেগুলোর নামই তো বললে না বাবু। কী নাম ওদের?'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন শাহদেও রাজবাড়ির নায়েব, ধূর্তশিরোমণি হরনাথ চৌধুরী। ঠোঁটটা সামান্য বেঁকিয়ে বললেন, 'ছোট দুটোর নাম চাঁদ আর ভৈরব।' তারপর একটু থেমে, যোগ করলেন, 'ওদের দরকার নেই এখন, আপাতত বড়ো দুটোর নাম মনে রাখবেন সাহেব, ওদেরই আগে ধরা দরকার। ওদের নাম সিদহো আর কানো। সিদহো মুর্মু আর কানো মুর্মু।'

*

'জায়গাটা ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল আর আজকে যেটাকে আমরা ঝাড়খণ্ড বলি, তার একদম সীমান্তে, বুঝলি?' তিন নম্বর পানের খিলিটা মুখে পুরে ফের গল্পটা শুরু করলেন দীপুপিসি।

এতক্ষণে বিকেল হয়ে এসেছে, এক রাউন্ড চা হয়ে গেছে অলরেডি। দীপুপিসি আবার চা কফি খান না একেবারেই, পিসির মৌজ হচ্ছে ওই দুখানিয়ার হাতের পানে। সেইটে চিবোতে চিবোতে পিসির চোখ আরামে বুজে এল প্রায়। ততক্ষণে আমরা চা দিয়ে একরাউন্ড পেঁয়াজি উড়িয়ে দিলাম। তারপর মা এসে যখন বলল এরপর বাদামভাজা দিয়ে মামাবাড়ি-স্পেশাল চালভাজা আসছে, তখন আমাদের আর পায় কে?

উল্লাসে সবাই মিলে বেশ ঘন হয়ে বসতেই পিসি শুরু করে দিলেন, 'জায়গাটার নাম বাঁশিডি। অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে একটা ছোট্ট গঞ্জ মতো। বরাভূম স্টেশনে নেমে,

পুরুলিয়া বাঘমুণ্ডি রোড ধরে, বলরামপুর টাউন পেরিয়ে ঘণ্টাদুয়েকের রাস্তা। বাঘমুণ্ডি পৌঁছবার আগে মাঠাবুরু বলে অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে এই জায়গাটা। তার সিনিক বিউটি নাকি আচ্ছা-আচ্ছা বিদেশী ট্যুরিস্ট স্পটের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, এমনই জানিয়েছিল দীপাঞ্জন, আমাদের এই আউটিং-এর আইডিয়াটা ওরই। থাকার মধ্যে একটা ব্রিটিশ আমলে বানানো ফরেস্ট বাংলো। ওইটেই ছিলো আমাদের আস্তানা।

জিওলজির ফিল্ড-ওয়ার্ক টিমের বাকিরা অবশ্য তার আগেই কাজ সেরে নিয়ে কলকাতা ফিরে গেছে। ফিল্ড ওয়ার্কের সময় আমরা ছিলাম বলরামপুরে। দলে সবশুদ্ধ ছিল জনা পঁচিশেক, দু'জন প্রফেসর আর তেইশজন স্টুডেন্ট। জিওলজির ফিল্ড স্টাডি যে কী টাফ সে আর কী বলব, যে না করেছে সে বুঝতে পারবে না। তবে তার আকর্ষণও অন্যরকম, মানতেই হবে। দশটা দিন যে কী করে আড্ডা গল্পগুজব আর হাসি-ঠাট্টায় কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। কোথায়-কোথায় গেছিলাম আজ আর মনে নেই। শুধু নেকরে, সিরিঙ্গি আর বেরসা এই তিনটে জায়গার নাম খুব মনে আছে।

তা ফিল্ড স্টাডি শেষ, বাকি লোকজন কলকাতা ফিরে গেছে। আমি আর মহুয়া থেকে গেলাম আমাদের আগেই প্ল্যান করা আউটিং-এর জন্যে। বাংলোটা অবশ্য দৌড়োদৌড়ি করে দীপাঞ্জনই ঠিক করে দিয়েছিল। এখন শুনেছি ওখানে একটা দুটো রিসর্ট টাইপ হয়েছে বটে, আমাদের সময়ে ওই ফরেস্ট বাংলোটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তার ওপর সেখানেও জায়গা পাওয়া ছিল ভেরি টাফ। আমরা যে জায়গা পেয়ে গেছিলাম বেশি চেষ্টাচরিত্র না করেই তার একটা কারণ আছে, সেটা পরে বলছি। তবে সে-বছর হাতির উৎপাত একটু বেশি হওয়াতে অনেকে এমনিতেই জায়গাটা এড়িয়ে চলছিলেন। সত্যি বলতে কি, সেই বছরে বাঁশিডির ফরেস্ট বাংলোতে শীতের সিজন শুরু হওয়ার মুখে আমরাই ছিলাম প্রথম ট্যুরিস্ট।'

'তোমরা দু'জন মেয়ে একলা ছিলেএএএএ?'

বলা বাহুল্য এই আর্তনাদটা মৌ-এর, কথায়-কথায় আতঙ্কিত হওয়া ওর স্বভাব। আরশোলা থেকে শুরু করে মাকড়শা, কালো বিড়াল থেকে শুরু করে এক শালিক, সবেতেই ওর বেজায় ভয়। একবার তো জোরে বাজ পড়ার আওয়াজ শুনে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছিল মেয়েটা।

ভুরু কুঁচকে মৌয়ের দিকে তাকালেন দীপুপিসি। পিসি ডাকাবুকো মানুষ, আলাস্কার হিমবাহ থেকে সৌদি আরবের মরু, অ্যামাজনের জঙ্গলে অববাহিকা থেকে সাউথ চায়না সি-র উত্তাল সমুদ্র, সব চষে বেড়িয়েছেন। ঘরকুনো ভীতু বাঙালি পিসির সখত না পসন্দ। গম্ভীর গলায় শুধু বললেন, 'দু'জনে মিলে কী করে একলা হয় সেটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বল তো!'

'না, মানে তোমাদের সঙ্গে তো কোনও ছেলে ছিল না...'

'অ, তার মানে সঙ্গে কমপক্ষে একজন ছেলে না থাকলেই মেয়েরা একলা, তাই না রে মৌ?' পিসির গলা আরও গম্ভীর।

মৌ স্রেফ ভেজা মুড়ির মতো মিইয়ে গেলো। পিসি ওর দিকে, ভালো বাংলায় যাকে বলে 'রোষাবিষ্ট', সেইরকম দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফের শুরু করলেন।

'অবশ্য শুধু যে আমরা দু'জন ছিলাম তা নয়, মহুয়ার ভাই দীপাঞ্জনের কথা তো আগেই বলেছি, সে-ও এসে আমাদের জয়েন করেছিল। ওর তখন সবে উচ্চমাধ্যমিক শেষ হয়েছে, হাতে অঢেল সময়। হেমন্তের শেষে আর শীতের শুরুতে নাকি জঙ্গলের একটা আলাদা আশ্চর্য সৌন্দর্য দেখা যায়, সেইসব শুনেই ওরই পরামর্শে প্ল্যানটা বানানো। দীপাঞ্জনেরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাবা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ছিলেন, তাঁকে ধরে-বেঁধে ওই ফরেস্ট বাংলোয় থাকার অনুমতি পাওয়া যায়। ওর সেই বন্ধুর পৈতৃক বাড়িও ছিল পুরুলিয়াতেই, মানবাজারে। ছোকরার নাম হলো জোশুয়া হেমব্রম। আগে যে পিটার হেমব্রমের নাম বলেছি, সে ওই জোশুয়ার দাদা।

আগেই বলে বলেছি যে ফরেস্ট বাংলোটা যেতে হয় বাঘমুণ্ডি পুরুলিয়া রোড ধরে। মাঠাবুরুতে নেমে দশ পনেরো মিনিটের একটা হাঁটাপথ। বরাভূম স্টেশনে নেমে, ট্রেকার ধরে দীপাঞ্জন যখন বলরামপুর এসে পৌঁছল, তখনই প্রায় দুপুর তিনটে বাজে। আমরা লাঞ্চ করে রেডিই ছিলাম। দীপাঞ্জনকে লাঞ্চ করিয়ে-টরিয়ে, বাজার থেকে ঝটপট করে চাল, ডাল, তেল আর আলু কিনে যখন বুধন হাঁসদা'র ভাড়া করা টেম্পোতে চেপে রওনা দিলাম, তখনই বাজে প্রায় পাঁচটা।

পৌঁছতে-পৌঁছতে প্রায় সাড়ে সাতটা বেজে গেল। তোদের মধ্যে যারা কখনও পুরুলিয়া গেছিস, তারাই জানবি যে ওখানকার শীতের সময়ে রাতের আকাশ কী চমৎকার। দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, মাথার ওপর সলমা জরি বসানো নীলচে-কালো মখমলী আকাশ, দু'পাশে শাল, পলাশ আর কেঁদ গাছের জঙ্গল, মস্ত বড়ো একটা অজগরের মতো শুয়ে থাকা রাস্তা, আর তার ওপর দিয়ে জণ্ডিস কালারের হেড লাইট জ্বালিয়ে চলছে এক পুরোনো টেম্পো আর তাতে আমরা তিনজন বসে আছি নির্বাক হয়ে, সে এক আশ্চর্য অনুভূতি, বুঝলি?

মাঠাবুরুতে জুনিয়র হাইস্কুলের মোড়ে আমাদের নামিয়ে দিয়ে বুধনদা ফিরে গেল। অ্যাদ্দিন ধরে আমরা বুধনদা, বুধনদা'র ছোট ভাই মংলু আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের টেম্পোতে চড়েই ফিল্ড ভিজিটে গেছি, ফলে বুধনদা

আমাদের চিনতোই। আর কেন জানি না আমার মনে হয়, আমার আর মহুয়ার ওপরে বুধনদা-র একটা মায়া পড়ে গেছিলো। কারণটা অবশ্য পরে জানতে পেরেছিলাম, যথাসময়ে বলবো সেটা। বুধনদা আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার আগে যেটা বলে গেলো তার মর্মার্থ হচ্ছে যে, এই ফরেস্ট বাংলোর কেয়ারটেকার রেংতা কিস্কু অতি চমৎকার ছেলে, তার বাড়ি বুধনদা-র শ্বশুরবাড়ির গাঁয়েই। ফলে তার স্বভাবচরিত্র তথা রন্ধনকুশলতার ব্যাপারে আমরা যেন নিশ্চিন্ত থাকি। আর প্রত্যেক দু'দিন অন্তর বুধনদা নিজে এসে একবার আমাদের খবর নিয়ে যাবে। অতি উত্তম প্রস্তাব, ফলে আমরা তিনটি মনিষ্যি হাসিমুখে বুধনদাকে থ্যাঙ্ক ইউ-ট্যাঙ্ক ইউ বলে সেই ফরেস্ট বাংলোর দিকে রওনা দিলাম।

এখনও যখন সেই ঘটনাগুলোর কথা মনের মধ্যে আসে, শুধু এইটুকু ভাবি যে, সেইদিন, সেই ক্রাইসিস মোমেন্টে বুধনদা তার কথা মতো আমাদের খোঁজ করতে না এলে কী-ই না হতে পারত?

সে যাই হোক, আমরা তো তিনজনে সেই ভাঙা সুঁড়িপথ ধরে হাঁটা দিলুম। আগেই বলেছি, সেদিন ছিল পরিষ্কার আকাশ। আকাশে কড়ে আঙুলের নখের ফালির মতো একটুখানি চাঁদ, টুকরোটাকরা হীরের কুচির মতো তারায় ভরানো একটা অসম্ভব পরিষ্কার আকাশ, চারিদিকে বুনো ফুলের মিষ্টি গন্ধ আর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মধ্যে হাতে বড় বড় টর্চ জ্বালিয়ে যখন বাংলোর দরজায় পৌঁছলুম তখন আমার ঘড়িতে বাজে রাত আটটা।

রেংতা কিস্কু জানতোই যে আমরা আসবো। ফলে আমরা যখন দেখলাম যে হাতে একটা একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে একটা বেঁটে-খাটো কালোমতো লোক হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে, তখন বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হইনি।

রেংতা আমাদের দেখে সেলাম-টেলাম ঠুকে তো একশা। লোকটার বয়েস বছর পঁয়ত্রিশ, সুঠাম চেহারা আর মুখে একটা থাউজ্যান্ড ওয়াটের স্মাইল। তার ওপর আমাদের কিনে আনা বাজারপত্তর দেখে তার আনন্দ আর ধরে না!

সে যাই হোক। একতলা বাংলো, সামনে একটা বড়ো আর একটা ছোটো ঘর, পেছনেও তাই, সব মিলিয়ে এই চারটি ঘর। মেইন গেট থেকে মোরাম বিছোনো পথ হেঁটে আসার পর কয়েকধাপ সিঁড়ি, তারপর বেশ চওড়া একটা বারান্দা আর বারান্দার শেষেই সামনের দুটো ঘরের পাশাপাশি দুটো দরজা। আমরা বারান্দায় আমাদের লাগেজ নামিয়ে রেংতাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী গো, কোন কোন ঘরে থাকব?' ঝকঝকে সাদা দাঁত বার করে একগাল হেসে হিন্দি, বাংলা, সাঁওতালি মিশিয়ে সে জানালো সব ঘরই খালি আছে, আমরা যেটা খুশি সেটা নিতে পারি।

আমাদের অবশ্য পছন্দ হলো পেছন দিকের ঘর দুটো। জানলা খুললেই চাপা-চাপা অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিশাল অযোধ্যা পাহাড়। তার মাথার ওপর সেই ছোট্ট একফালি চাঁদ। প্রথমে ঢুকেছিলাম ছোটো ঘরটায়, দীপাঞ্জন তো বিছানা দেখেই সটান শুয়ে পড়ল, বলল, 'আমার আর শরীরে দিচ্ছে না। তোমরা ফ্রেশটেশ হয়ে নাও, তারপর ডিনারের জন্যে ডেকো।'

তারপর স্নানটান করে ফ্রেশ হতে হতে ন'টা বেজে গেলো। এখানে জানিয়ে রাখা ভালো যে বাংলোটা ব্রিটিশ আমলে তৈরি। পুরোটাই শালকাঠের, মায় মেঝেটা অবধি। উঁচু-উঁচু সিলিং, ফোর পোস্টার বেড, মেহগনি কাঠের তৈরি রাইটিং ডেস্ক, সব মিলিয়ে রাজকীয় ব্যাপার। সেই অঞ্চলে তখন সবে ইলেক্ট্রিসিটি এসেছে। তা-ও সন্ধে হলেই বড়ো-বড়ো লণ্ঠন বা হ্যাজাক জ্বালানোর জন্যে তৈরি থাকতে হতো। ওখানে তখন সন্ধে মানেই রাত, সাতটার সময় সব শুনশান, রাস্তায় জনমনিষ্যির দেখা নেই। আমাদের অনভ্যস্ত শহুরে চোখে প্রথম-প্রথম অদ্ভুত লাগত, পরে বুঝেছিলাম যে ওই অঞ্চলে ওটাই স্বাভাবিক।

তবে এসব অসুবিধা ভুলিয়ে দিয়েছিল পুরুলিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য। দিনের-পর-দিন ওই অঞ্চলে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে-করতে জায়গাটার সঙ্গে আমার বেশ একটা সখ্য গড়ে উঠেছিলো। দিনের বেলার রোদটা নরম মোমের মতো গায়ে লেগে থাকে। আর বিকেল নামার সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাজিকের মতো জায়গাটা বদলে যায়। মিঠে বাতাস, মহুয়াফুলের মিষ্টি গন্ধ, শাল, কেঁদ আর পলাশ বনের নয়নশোভন জঙ্গল, আর অজস্র নাম না জানা পাখিদের ওড়াউড়ি, আমার তো থাকতে থাকতে নেশাই ধরে যাচ্ছিল...'

ফের বিপদতারণ শ্রীমধুসূদন, অর্থাৎ স্যান্ডিকুমারের খকখক কাশি। পিসি এই কাশির অর্থ খুবই ভালো বোঝেন। এর মানে হচ্ছে, 'গল্পের গাড়ি বেলাইন হচ্ছে পিসি, প্লিজ লাইনে ফিরে এসো।' এবার আর পিসি রাগ করলেন না। একটা পানের খিলি সলজ্জভাবে মুখে পুরে বললেন, 'সরি রে, আসলে একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলুম।'

সে যাই হোক। সে রাত্রে রেংতার বানানো দুর্দান্ত ডিমের কারি আর আলুভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ার পর কখন যে দু'চোখের পাতা ভারী হয়ে ঘুম নেমে এল তা বুঝতেই পারলাম না!

আসল কাহিনি শুরু হলো পরদিন থেকে।'

*

বর্ষণক্লান্ত মধ্যরাত। অযোধ্যাপাহাড়ের কোলে, একটি বড় পাথরের নীচে, কাঠকুটো দিয়ে জ্বালানো আগুন ঘিরে বসেছিলেন চারজন মানুষ। একজন পুরুষ আর তিনজন মহিলা।

চারজনের কেউই কোনও কথা বলছিলেন না। বৃষ্টি অনেকক্ষণ আগে থেমে গেছে, আকাশ যদিও এখনও ঢেকে আছে ঘনঘোর মেঘে। কাঠকুটো পোড়ার শব্দ ছাড়া বিশ্বচরাচরে আর কোনও শব্দ নেই।

একটু আগেই প্রবল ঝড়জল হয়ে গেছে এই এলাকায়।

এখনও জোর বইছে বাতাস। সেই জোলো বাতাসে শীত করার কথা। কিন্তু চারজনেই বসে ছিলেন স্থির চিত্রটির মতো, যেন প্রকৃতির এই তাণ্ডবে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। পুরুষটির বয়েস চল্লিশের আশেপাশে, গায়ে কাপড় বলতে একটি ময়লা খেটো ধুতি, ল্যাঙটের মতো করে পরা। মহিলা তিনজনের পরনে কালোপাড় সাদা শাড়ি। সেই শতচ্ছিন্ন, ময়লা, কাদা রঙের শাড়ি দেখলেই বোঝা যায় যে দারিদ্র্যের কোন নিঃসীম অতল গহ্বরে এদের বাস। অপুষ্ট হাড়-জিরজিরে শরীর সব্বারই, চোখে বাসা বেঁধে আছে ঘটমান বর্তমানের ভয়াল বিভীষিকা আর অজানা ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিঃশেষ উদ্বেগ।

'সিদু আর কানুর হলটা কী?' দেশীয় ভাষায় প্রশ্ন করলেন একজন মহিলা, 'তাদের খবর কী?'

'কোম্পানির সেপাইরা ধরে নিয়ে গেছে তাদের। গত পরশু দুপুরবেলা।' দেশীয় ভাষাতেই স্তিমিত স্বরে উত্তর দিলেন পুরুষটি, 'উপরবান্দা গ্রামের জগমাঝি টুরিয়াচাঁদ কিস্কুর বাড়ি থেকে। দুপুরে খেতে বসেছে, এমন সময় হঠাৎ দেখে সেপাইরা ঘিরে ফেলেছে ওদের।'

'তারপর?' তিন বৃদ্ধাই উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন।

'লড়েছিল বটে দুইজনে, বাঘের বাচ্চা!' সেই স্তিমিত স্বরের মধ্যেও ঝলসে ওঠে ক্রোধ, 'কুড়াল দিয়ে দিয়েছিল পাঁচ-পাঁচটা জোয়ান সেপাইয়ের মুণ্ডু উড়িয়ে। আমার দুই বেটাও ছিল ওদের সঙ্গে, রূপাই আর লখাই। তারাও লড়েছিলো খুব। মরদ হয়েছে আমার ছেলেগুলো রে ডানবুড়িরা, খুব মরদ হয়েছে।' বলতে-বলতে চোখের জলে ভেসে যায় মানুষটির রুখাশুখা বুক।

'তারপর?'

'কেটে ফেলেছে ওদের। গলা কেটে ভাসিয়ে দিয়েছে কাঁসাইয়ের জলে। দেহগুলো ফেলে গেছিল গ্রামের জাহের থানে। সিদো, কানু, আর আমার লখাই।' সন্তানহারা বাপের চোখে উপচে পড়ে ভরা বর্ষার যোজন জলধারা।

'আর রূপাই?' প্রশ্ন করেন একজন বৃদ্ধা।

'কাঁসাই নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলো বেটা আমার। ভরা বর্ষার কাঁসাই, সে-ও বোধহয় আর বেঁচে নেই।' চোখ মুছতে-মুছতে বলেন সেই মানুষটি।

'কী করে হয়?' হিসহিসিয়ে ওঠেন আরেক মহিলা, 'সারা মানভূম আর ধলভূমের মাটি যাদের আগলে রেখেছে মায়ের মতো, অযোধ্যা পাহাড়ের সবক'টা গাছের পাতায় লেখা যাদের নাম, যাদের এক চোখের তারায় বাস করে পিলচু হড়াম আর চোখে পিলচি বুড়হি, তাদের ধরে নিয়ে যায় কোন শয়তান? কী করে?'

'আমাদের সমাজের কেউ নয় রে ডানবুড়ি। আমাদের সমাজের হলে কেটে রেখে আসতাম না সেই কুকুরটাকে? ওদের ধরিয়ে দিয়েছে একটা দিকু, বাঙালি দিকু।'

'নাম বল রে বেদিয়া, কে করেছে এই কাজ? কার জন্যে সিঙবোঙার অভিশাপ নেমে এল আমাদের সোনার বাছাদের মাথায়? গুণ করবো তাকে, মুখে রক্ত উঠে মরবে সে, এই বলে দিলাম রে বেদিয়া। তার জনম-জনম খাব আমরা এই তিন ডাইনি বোন। এ দিগরে না আছে আমাদের কোনও আটকান, না আছে কোনও বাঁধন। বল রে বেদিয়া, মারাংবুরুর বুক খুঁড়ে তুলে এনেছি কালিয়া মাসানের বিষ, ঢেলে দেব সেই শয়তান দিকুর বুকে, তার সবকিছু জ্বলে ছাই হয়ে যাবে, যাবে, যাবে। শুধু বল রে বেদিয়া, কে করেছে এই কাজ' তৃতীয় মহিলার চোখে ধক করে জ্বলে উঠল কালসর্পতুল্য ঘৃণাবিষ।

এরপর চুপ করে থাকে সবাই। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মাঝখান দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ঘনকৃষ্ণ আকাশ। বর্ষার জঙ্গলের মধ্যে থেকে উঠে আসছিল ডালপাতা পচা ভ্যাপসা গন্ধ। তার মধ্যেই মাথার দিয়ে ওপর কর্কশ স্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল একটা রাতচরা পাখি। কাঠকুটোর আগুন বেশ খানিকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে তখন। অল্প আঁচের আভা বিছিয়ে ছিল তাদের সবার চোখেমুখে। সেই অনন্ত মৌনতা ভেঙে মুখ খোলেন পুরুষটি,

'পারানিক আর গডেতরা লুকিয়ে-চুরিয়ে খবর এনেছে শহর থেকে। এ-কাজ করেছে শাহদেও রাজপরিবারের নায়েব। অনেকে টাকা খেয়েছে রে ডানবুড়ি, অনেক টাকা খেয়েছে লোকটা। তাতেও আশ মেটেনি শয়তানটার। তারপর সিদোকে খেল, কানুকে খেল, আমার লখাইকে খেল...' আর বলতে পারে না লোকটা, কান্নার বেগে গলাটা বন্ধ হয়ে আসে। চুপ করে থাকে বাকিরা।

'তাদের দেহগুলোর কী হল রে? জানিস কিছু?' প্রশ্ন করেন প্রবীণতম বৃদ্ধাটি।

'লুকিয়ে-চুরিয়ে ওদের দেহগুলো আমরা নিয়ে গেছিলাম দলমা-র জঙ্গলে। জ্বালিয়ে দিয়েছি ওদের, ওখানেই। এই দেখ ডানবুড়ি।' এই বলে গেঁজে থেকে একটা কাপড়ের পুঁটলি বার করেন সেই শোকাহত মানুষটি, 'এই দেখ আমার লখাইপোড়া ছাই। অমন পাহাড়ের মতো মস্ত ছেলেটা আমার এই এত্তটুকু ছাই হয়ে গেল রে বুড়ি। ওরে আমার যে আর কেউ রইল না রে, আমার ঘর রইল না, বার রইল না। লখাই-রূপাই যে আমার দুটো বুকের পাঁজর ছিল রে, জোয়ান ছেলেদুটো আমার। আমার যে আর কেউ রইল না বুড়ি, কিছু রইল না।' এই বলে বুক চাপড়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে মানুষটি।

সমস্ত জঙ্গল যেন শিউরে উঠল সেই কান্না শুনে। মস্ত শালপিয়ালের বন জুড়ে, বিশাল অযোধ্যা পাহাড়ের বুক চিরে, মাথার ওপর অনন্ত আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেন কেউ ঘুরে-ঘুরে কাঁদতে লাগল, 'আমার আর কেউ রইল না, কিছু রইল না।' বাতাসের পরতে-পরতে ঘুঙুরের আওয়াজের মতো জড়িয়ে গেলো সেই কান্না, 'আমার আর কেউ রইল না, কিছু রইল না।' তারার আলোয়, মাটির ওমে, মহুয়ার ফুলে, যেন কেউ উজাড় করে দিল তার

বুকভাঙা দুঃখের জল, 'আমার আর কেউ রইল না, কিছু রইল না।'

উঠে দাঁড়ান একজন বৃদ্ধা, হাত বাড়িয়ে পুঁটুলিটা হাতে নেন। পুঁটুলিটার ওপর বিড়বিড় করতে-করতে হাত বোলাতে থাকেন। তারপর বাকি দুই সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ওঠ রে ডাইনি বোনেরা আমার। জাগিয়ে তোল মারাংবুরুর রাগ। আয়, এই ছাইয়ে মিশিয়ে দিই কালিয়া মাসানের বিষ। আর শোন রে বেদিয়া, আমরা নেব তোর চোখের মণি আর বুকপাঁজরের রক্ত। আর সেই রক্তভেজা জাদু এই ছাইতে মিশিয়ে দেবে হাজার কালনাগিনীর গরল। যে করে হোক, এই ছাই তুলে দিস সেই বিশ্বাসঘাতক দিকুর মুখে। যে আমাদের বাছাদের ধরিয়ে দিয়েছে সেপাইদের হাতে, খুন করেছে আমাদের ছেলেদের, দু'দিনের মধ্যে মুখে রক্ত উঠে মরবে সে। মরবে অশেষ কষ্ট পেয়ে। তার বুক জ্বলে যাবে আগুনে, তার চোখ খুবলে খাবে নরকের দেও'রা। সে না পারবে জেগে থাকতে, না পারবে শান্তিতে ঘুমোতে। যত আবগে বোঙ্গা আছে দুনিয়াতে, তাদের ডেকে তোল রে বোনেরা। কালসিং আর গদরবোঙ্গা নেমে আসুক সেই দিকুটার ওপর, সবাই মিলে চুষে খাক ওর রক্ত মাংস আর অস্থি মজ্জা।'

মানুষটা চুপচাপ বসে ছিলেন। প্রবল শোকে তাঁর বুকের মধ্যে উথলে উঠেছে কান্নার ঢেউ। তাঁর কাছে এসবই অর্থহীন লাগছিলো। নিস্তেজ স্বরে তিনি বলেন, 'সে তো টাকাপয়সা নিয়ে কলকেতা না কোথায় চলে গেছে। তার ঠিকানা কেউ জানে না। তার কাছে পৌঁছব কী করে?'

তারপর সেই তিন ডাইনিবুড়ি আরও ঘন হয়ে আসে, 'পাবি রে বেদিয়া, তাকে পাবি। যতদিন না পাস, ততদিনে তুই খুঁজে বেড়াবি সেই শয়তানটাকে। শোন রে ছেলে, তোকেও জাদুটোনা করবো আমরা। এই রক্তবিষের কাটান হতে পারে শুধু তোর নিজের রক্ত। তাই তোর এই রক্তমাংসের দেহ নিয়ে নেব আমরা, যাতে করে এই বিষের কোনও জবাব না থাকে। তার বদলে তোকে আমরা দেব ছাইয়ের দেহ, ছাইয়ের জীবন। খুঁজে বেড়াবি সেই দিকুকে, জনমভর। সে না হোক তার ছেলে, তার ছেলে না হোক তারও ছেলে... কাউকে না কাউকে একদিন তুই খুঁজে পাবিই রে বেদিয়া। ততদিন তুই মরবি না, তোর ছাইয়ের দেহ থাকবে এমনই সুঠাম, এমনই সবল। ওই বিশ্বাসঘাতকের বংশের কারও না কারও বুকে এই কালিয়া মাসানের ছোবল না বসালে তোর মুক্তি নাই রে বেদিয়া, তোর মরণ নাই।'

এই বৃষ্টিভেজা অরণ্যরাত্রিতে, এই নিভন্ত আগুনের আঁচে, এই তিন ডাইনিবুড়ির কথায় সব গোলমাল হয়ে গেল মানুষটার। কার পাপে কার শাস্তি হয়? মানুষের পাপের ফল তার সন্তানদের ওপর অর্শায় কীসে? কতদিন থাকে পাপ আর পুণ্যের উত্তরাধিকার? কাকেই বা বলে পাপ, কাকেই বা বলে পুণ্য? কোনটা ন্যায় আর কোনটাই বা অন্যায়? ভালোই বা কী আর মন্দই বা কী? এ-সব বোধের থেকে অনেক দূরে চলে গেছিলেন তিনি, তাঁর চৈতন্য আর কাজ করছিলো না তখন। ভূতগ্রস্তের মতো উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'তাই কর রে ডানবুড়িরা। বুকে বড়ো জ্বালা রে আমার, বড় জ্বালা। হা রে আমার লখাই..হা রে আমার রূপাই...' দু'হাত আকাশের দিকে তুলে আবার হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন তিনি।

*

'পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠে দেখি মহুয়া আগেই উঠে পড়েছে। আমার বিছানার উল্টোদিকের দেওয়ালেই একটা বিশাল জানলা ছিল। মহুয়া দেখি সেই জানলার সামনে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে, নাকমুখ গ্রিলে ঠেকিয়ে রেখেছে। আমি হাই তুলতে-তুলতে বললাম, 'কী রে মৌ, কখন উঠলি ঘুম থেকে?' জবাবে মহুয়া আমার দিকে ফিরে একটা ঘর আলো করা স্মাইল দিয়ে জানলাটা ছেড়ে দাঁড়াল। আর আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম প্রায়!

অযোধ্যা পাহাড়টা যে এত কাছে সেটা কাল বুঝিনি। গত রাতে বোধহয় একচোট বৃষ্টি হয়ে গেছে, শীতের বাতাসে একটা ঠান্ডা ফ্রেশ-ফ্রেশ ভাব। আর নীল ঝকঝকে আকাশ জুড়ে কালচে-সবুজ আর গেরুয়া রঙ মেখে দাঁড়িয়ে আছে অযোধ্যা পাহাড়। হেমন্তের শেষে হলুদ পাতায় সাজানো সেই পাহাড়ী বন কী মায়াঘোরই না বিছিয়ে রেখেছে। আকাশে উড়ছে নাম না জানা পাখিদের দল। আমাদের বাংলোর বারান্দার পরেই সাজানো বাগান, আর এই পুরো বাংলো ঘিরে আছে শক্ত শালবল্লার বেড়া। বেড়ার ওপার থেকেই শুরু মেঠো জঙ্গুলে পথ। ঝরাপাতা বেছানো সেই পথ ধীরে ধীরে মিশেছে ঘন বনের মধ্যে। সব মিলিয়ে পুরো দৃশ্যটা ঠিক যেন আমাদের ছোটবেলার আর্চিসের গ্রীটিংস কার্ডে আঁকা ছবি একখানা।

আমি উঠে এসে ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই আরেক চমক! বারান্দা থেকে একদম সামনেই অযোধ্যা পাহাড়, আর বারান্দার একদম ডানকোণে গিয়ে ঘাড় ঘোরালেই দূরে দেখা যাচ্ছে দলমা পাহাড়ের রেঞ্জ! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, বুঝলি! ভাষায় বোঝাতে পারব না। বাংলোর বাইরেটায় মনে হচ্ছে কে যেন সবজে হলদে কার্পেট পেতে দিয়েছে, আর তার ওপর টুপটাপ করে এসে পড়ছে বড়ো-বড়ো শালপাতা। ঝলকে-ঝলকে মনমাতানো ঠান্ডা বাতাস আর তার সঙ্গে মেশানো একটা বুনো গন্ধ আমাদের নাকে এসে লাগতেই মনে হল, আহ, মাত্র তিনদিন কেন? আরও কয়েকদিন থেকে যাই না এখানে?

রেংতার হাতে বানানো দুর্দান্ত রুটি সবজি আর ডিমসিদ্ধ খেয়ে আমরা তিনজনে যখন তৈরি তখনই বাইরে টেম্পোর

হর্ন। দেখি বুধনদা-র ঠিক করে দেওয়া আরেক গাড়িওয়ালা মংলাদা তার টেম্পো নিয়ে এসে হাজির। দেখে আমাদের তো খুশি আর ধরে না। একটা বেতের বাস্কেটে রেংতার বানানো লাঞ্চ নিয়ে রওনা হতে আমাদের লাগলো ঠিক দশ মিনিট। তারপর টেম্পো চলল অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে।

রাস্তার সিনিক বিউটির বর্ণনা দিয়ে আর তোদের হিংসে বাড়াব না। শুধু একবার বলব যে প্রথম যখন স্কটিশ হাইল্যান্ড দেখি, তখনও ঠিক এইরকমই অনুভূতি হয়েছিল। এই শীতে তোরা বন্ধুরা মিলে ঘুরে আয় না একবার। এখন অবশ্য রাজ্যের ট্যুরিস্টরা গিয়ে তার কী হাল করেছে বলতে পারব না।

সে যাই হোক, লোয়ার ড্যাম আপার ড্যাম পেরিয়ে যখন বামনী ফলস পৌঁছই তখনই বেশ দেরি হয়ে গেছিল। সকালের হেভি ব্রেকফাস্ট তখন পেটের মধ্যে কোথায় যে তলিয়ে গেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। রাস্তা থেকে প্রায় তিনশো মিটার নীচে নামলে বামনী ফলস। তরতর করে পাথুরে পথ সামলে নেমে তো গেলুম, তারপর সেখানে ঘণ্টাখানেক কাটাবার পর উঠে আসতে সে-যে কী কষ্ট তা আর কী বলব!

তারপর গেলুম তুর্গা ড্যাম। সেখানে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখে আমরা মোহিত। দীপাঞ্জন তো হাতফাত নেড়ে হেঁড়ে গলায় 'ভারত আমার ভারতবর্ষ' গেয়েটেয়ে একশা! আমরা সেখানেই রেংতার বানানো অসম্ভব ভালো ঝাল ঝাল চিকেন কারি, রুটি আর জিলিপি দিয়ে লাঞ্চ সেরে নিলাম।

নীচে নেমে এসে এসে মংলা-কে এরপর কোথায় যাব জিজ্ঞেস করাতে যখন শুনলাম যে এরপর আমাদের গন্তব্য দুয়াসিনির হাট, তখন সারাদিনের ক্লান্তি সত্ত্বেও আমি আর মহুয়া ভারি আহ্লাদে নেচে উঠলাম। এই এলাকার গ্রামের হাট মানেই লাক্ষার তৈরি দারুণ দারুণ সব জাঙ্ক জুয়েলারি তো আছেই, তাছাড়া সাঁওতালদের তৈরি খুব ভালো ভালো হ্যান্ডিক্রাফটস পাওয়া যায়। কাছেই চড়িদা গ্রাম, ছৌ নাচের মুখোশ তৈরি করার জন্যে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। আমরা দুই সখী তো শুনেই খুব চনমনে, দীপাঞ্জন মিনমিন করে 'আজ খুব রাত হয়ে যাবে' টাইপের অজুহাত খাড়া করলেও বিন্দুমাত্র পাত্তা দিইনি। মংলাদা-কে বললাম চলো দুয়াসিনি।

সেই দুয়াসিনির হাটেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, যেখান থেকে আমাদের কাহিনি শুরু।

আমরা তিনজনে হাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর পাঁচটা আদিবাসী হাট যেমন হয় এটাও সেরকমই। মাটিতে প্লাস্টিকের তেরপল বিছিয়ে লোক্যাল আর্টিফ্যাক্টসের জিনিস আর তার সঙ্গে কাঁচা তরিতরকারি, স্থানীয় খাবারদাবার ইত্যাদির দোকান। হাটের পেছনদিকটায় হাঁড়িয়া আর মহুয়ার ঠেক, তার উগ্রগন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে।

মহুয়া আবার জাঙ্ক জুয়েলারির নামে পাগল, তাকে দেখে সেই ড্যাঞ্চিবাবুদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আর কী। আমাদের কেনাকাটা শেষ হওয়ার পরেও ওকে দেখে মনে হচ্ছে তার মার্কেটিং-এর আশ এখনও মেটেনি, পারলে এই দুয়াসিনির হাটের একটা অংশ সে কলকাতাতেই নিয়ে যায়!

মহুয়াকে জোরজার করে টেনে আমরা বেরিয়ে আসবো, এমন সময় দেখি বেরোনোর রাস্তার মুখেই ছোট্ট একটা ঘুগনির ডালা নিয়ে একটা ঘুগনিওয়ালা বসে আছে।

এখানে বলে রাখি যে আমাদের কলেজের 'ঘুগনি ও ফুচকাপ্রেমী সমিতি'-র প্রেসিডেন্ট ছিল মহুয়া। যে কোনও জায়গায়, যে কোনও পরিস্থিতিতে দু-প্লেট ঘুগনি বা খান বিশেক ফুচকা উড়িয়ে দেওয়া ওর কাছে কোনও ব্যাপারই ছিল না। সে তো হাসিমুখে গিয়ে 'দাদা, দু-প্লেট ঘুগনি দাও তো' বলে স্ট্রেট দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমার কেমন জানি খেতে ইচ্ছে হল না। তোরা তো জানিস, হাইজিনের ব্যাপারে আমি একটু বেশি পিটপিটে। যেখানে সেখানে ইয়ে-ইয়ে হাতে বানানো খাবার খাওয়া আমার পোষায় না।

দীপাঞ্জনও 'এখন খেলে আর খেতে পারব না' বলে দাঁড়িয়ে রইল। মহুয়া অবশ্য যেভাবে বুভুক্ষুর মতো দাঁড়িয়ে ছিল তাতে মনে হওয়া খুবই সম্ভব যে মেয়েটা এক্ষুনি আফ্রিকার কোনও দুর্ভিক্ষপীড়িত জায়গা থেকে এসেছে, আর ওর সামনে এখন একহাঁড়ি বিরিয়ানি।

আমার কেমন জানি একটা অস্বস্তি হচ্ছিলো। তোরা তো জানিস, আমার সিক্সথ সেন্স জিনিসটা খুবই প্রবল। শুধুই মনে হচ্ছিল কিছু একটা যেন ঠিক হচ্ছে না। কী যেন একটা মস্ত ভুল হতে চলেছে। অথচ তার কারণটা কিছুতেই ধরতে পারছি না। এমন সময় চোখ গেল ঘুগনিওয়ালার দিকে। আর অস্বস্তিটা চতুর্গুণ বেড়ে গেল।

অথচ লোকটাকে দেখে এমন আলাদা কিছু লাগার কথাই নয়। এই এলাকার গরীব মানুষজন যেমন হয় তেমনই। রোগাসোগা শরীর, সারা গায়ে একটা ময়লা চাদর জড়ানো, সেটাই মাথা থেকে কপাল অবধি ঢেকে রেখেছে। লোকটার চোখ নামানোই ছিল, মহুয়ার কথা শুনে শিরা-ওঠা হাতে বাঁ-হাতে একটা শালপাতার ডোঙা নিয়ে, ডানহাতে ধরা বড়ো চামচ দিয়ে ডালার ওপরে রাখা মস্ত অ্যালুমিনিয়ামের থালা থেকে ঘুগনি নিয়ে বেড়ে দিতে লাগল। কোনও কারণ ছিল না, তবুও আমি বেশ মন দিয়ে লোকটাকে লক্ষ করতে লাগলাম।

আমি মহুয়ার থেকে একটু কোনাকুনি দাঁড়িয়েছিলাম, লোকটার মুখের বাঁ-দিক আর চাদরটা সরে গিয়ে সেদিকের কাঁধটা আমার চোখের সামনে দেখা যাচ্ছিল। আমার কেমন যেন মনে হল যে এই কাঁধটা আমি দেখেছি, এবং শুধু তাই নয়, খুব সম্প্রতি দেখেছি। কিন্তু কোথায় দেখেছি সেটা কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না।

লোকটা ঘুগনিটা দিল, চামচটা রাখল থালার কিনার ঘেঁষে। তারপর ডালার একটু নীচ থেকে একটা ময়লা

পুঁটুলি বার করল। আমি তখনও দেখে যাচ্ছি। পুঁটুলি মধ্যে থেকে কী একটা বার করে, খুব সম্ভবত বিটনুন হবে, ঘুগনির ওপর ছড়িয়ে দিল। তারপর একটা শালপাতার টুকরো চামচ হিসেবে ঘুগনিটার মধ্যে গুঁজে দিয়ে সেটা বাড়িয়ে দিল মহুয়ার দিকে।

পুঁটুলিটা দেখেই আমার ঘেন্না লাগছিল খুব। কিন্তু মহুয়াকে এসব বলে খুব একটা লাভ নেই। সে ততক্ষণে একসঙ্গে অনেকটা ঘুগনি মুখে তুলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে চিবোতে চিবোতে আমাকে বলল, 'কী রে দীপু, একচামচ খাবি নাকি?' আমি যথারীতি ঘাড় নেড়ে না বলে ব্যাগ থেকে দু'টাকা বার করে লোকটার সামনে এসে তার হাতে টাকাটা দিতে গিয়ে দেখি লোকটা এইবার চোখ তুলে তাকিয়েছে, আর সটান তাকিয়ে আছে মহুয়ার দিকেই।

সেই দৃষ্টি দেখে আমার বুকের ভেতরটা একবার ধক করে উঠলো, জানিস! পাকা করমচার মতো টকটকে লাল সেই চোখ দুটোর কোনায় এমন একটা শয়তানি হাসি যেটা দেখলে অতি বড় সাহসীরও বুক কেঁপে উঠতে বাধ্য। আমি চট করে টাকা দুটো প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে মহুয়ার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসছি, এমন সময় সেই বিটনুনের পুঁটুলিটা থেকে খানিকটা বিটনুন উড়ে এসে আমার হাতে এসে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে সেই নুনটা ঝেড়ে ফেলতে যাচ্ছি, দেখি নুনের দানাগুলো আমার হাতে লেপ্টে গেলো।

আর তখনই বুঝলাম যে এটা নুন নয়।

এটা ছাই।

এই ছাই কয়েকদিন আগেই আমরা দেখেছি একবার।

কলেজ স্ট্রীট থেকে শেয়ালদা যাওয়ার সময় যে লোকটার টানা রিকশায় গেছিলাম, তার গা থেকে এইরকম ছাই উড়ে আসছিল।

তার চোখটাও এরকম ছিল, তার কাঁধটাও এরকম। তাই আমার অত চেনা-চেনা লাগছিল।

এই লোকটাই সেই লোকটা।

বিদ্যুৎচমকের মতো কথাগুলো একের-পর-এক মাথার মধ্যে গেঁথে যেতেই আমার গা-টা ভয়ে আর আতঙ্কে শিরশির করে উঠল। আর ঠিক সেই সময়ে হু-হু করে হাড়ে কাঁপুনি ধরানো, মড়া পোড়ানো গন্ধ মেশানো একটা প্রবল হাওয়া যেন কোথা ছুটে এসে আমাদের ঘিরে ধরে নাচতে লাগল, আর কে যেন হা-হা করে হেসে উঠে ক্রুরস্বরে বলল, 'কালিয়া মাসান, কালিয়া মাসান।'

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে জায়গাটা খালি, যেন কেউ ওখানে কখনও ছিলই না।

মহুয়া আর দীপাঞ্জনকে নিয়ে আমি ছুট লাগালাম মংলাদা-র টেম্পোর দিকে। ঝটপট করে উঠে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললাম, 'বাংলোয় চলো মংলাদা। এক্ষুনি।

আর সেই রাতেই জ্বর এল মহুয়ার। বেহুঁশ করে দেওয়া প্রবল জ্বর।

*

এতক্ষণ কথা বলে দীপুপিসির গলা শুকিয়ে গেছিল। স্যান্ডির দিকে তাকাতেই স্যান্ডি একটা পান আর জলের বোতল পিসির দিকে এগিয়ে দিল, আর পিসি ওর দিকে তাকিয়ে একটা মধুর স্নেহের হাসি উপহার দিলেন। তখন বাজে প্রায় সন্ধে সাড়ে ছ'টা, মা উঠে গেছিল আরেক রাউন্ড চা বানাবে বলে। মা ফিরে আসতে সবাই এক কাপ করে চা হাতে নিয়ে বসলাম। আগেই বলেছি যে পিসি চা খান না। কচর-মচর করে পানটা চিবোতে-চিবোতে পিসির চোখটা আরামে বুজে এল, অস্ফুটে বলে উঠলেন 'আহা, লাভলি।' সবাই চা টা খেয়ে ফের একটু সতেজ হয়ে নড়েচড়ে বসতে পিসি ফের শুরু করলেন।

'সেই রাতটার কথা আমার খুব মনে থাকবে রে। অমন বিপদে জীবনে কখনও পড়িনি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আর যেন কোনওদিন পড়তেও না হয়।

টেম্পোতে বসেই কেমন যেন চুপ করে গেছিল মহুয়া, কোনও কথা বলছিল না। দীপাঞ্জনও একটু ঘাবড়ে গেছিল। আমি গাড়িতে যেতে-যেতে একবার ঠেলা দিলাম মহুয়াকে, বললাম 'কী রে মৌ, চুপ করে গেলি যে।' কিছু বলল না মেয়েটা, শুধু একবার অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকাল। খেয়াল করলাম চোখটা লাল হয়ে আছে একটু।

বাংলোয় পৌঁছে মংলাদা-কে ছেড়ে দিলাম। বললাম পরদিন সকালে আসতে। ইচ্ছে ছিল পরের দিন জঙ্গলের একটু ভেতরের দিকে যাব। মংলাদা টেম্পো ঘুরিয়ে চলে যেতেই অন্ধকারটা ঘিরে ধরল আমাদের। মেন গেট থেকে বারান্দা অবধি মোরাম বিছানো রাস্তা, আমরা হেঁটে-হেঁটে যাচ্ছি, এমন সময় মহুয়া হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা তো অবাক, জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রে, কী হল?'

একটু অস্বাভাবিক গলায় মহুয়া সামনের দিকে আঙুল তুলে একবার শুধু বলল, 'লোকটা।'

আমরা তো সামনে বা আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না। আগেই বলেছি, ছোটোবেলা থেকেই আমার আইসাইট খুব শার্প, আমার দেখার ভুল হতেই পারে না। তাছাড়া, দীপাঞ্জনও কিছু খুঁজে পেল না। আমি একটা কড়া করে ধমকই দিলাম মহুয়াকে, 'কোথায় কে? ভুল দেখছিস নাকি?' খানিকক্ষণ চুপ থেকে মহুয়া সেই একই গলায় শুধু একবার বলল, 'হুঁ।'

ঘরে ঢুকে বাথরুমে গেলাম ফ্রেশ হতে। ঢোকার সময়ে দেখি মহুয়া সটান শুয়ে পড়েছে ওর বিছানায়, ডানহাতটা উলটো করে কপালে দিয়ে। সারাদিন অনেক ধকল গেছিল, ফলে স্নানটান করে বাথরুম থেকে বেরোতে আমার দেরিই হল খানিকটা। বেরিয়ে দেখি তখনও মেয়েটা বিছানায় ওভাবেই শুয়ে আছে। আমার একটু সন্দেহ হল, জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রে মৌ, স্নান করতে যাবি না?'

বিন্দুমাত্র না নড়েচড়ে সেই অদ্ভুত গলায় উত্তর দিল মহুয়া, 'না রে, শরীরটা ভালো লাগছে না।'

কাছে গিয়ে ডানহাতের চেটোর উল্টোপিঠটা ওর কপালে রাখলাম। হুঁ। যা ভেবেছি তাই, গা-টা বেশ গরম হয়েছে। হতেই পারে, বাড়ির আদুরে মেয়ে, আমার মতো গেছো নাকি, যে সারাদিনের এত পরিশ্রম সইবে?

চোখ বুজে রেখেছিলো মহুয়া। জোর করে মাথা থেকে ওর হাত সরিয়ে ডান চোখের নীচের পাতাটা টেনে ধরলাম, আর মোমবাতির অল্প আলোয় ওর চোখদুটো দেখে বেশ খানিকটা চমকে গেলাম। দুটো চোখই টকটকে লাল হয়ে আছে!

'কী রে, হলটা কী তোর?' উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

'শরীরটা ভালো না রে।' সেই অস্বাভাবিক গলায় স্তিমিত ভাবে বলল মহুয়া।

বেশ চিন্তায় পড়া গেল তো, বিদেশে-বিভূঁইয়ে এ কী গেরো রে বাবা! এখানে বলে রাখি যে সেকালে ওই অঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা আজকালকার মতো এত ভালো ছিল না, চাইলেই চট করে হাসপাতাল নার্সিংহোম অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি পাওয়া ছিল ভারি মুশকিল। তার ওপর জায়গাটা পুরুলিয়ার একপ্রান্তে অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে, তখনকার দিনের নিরিখে শহুরে সুযোগ-সুবিধার বাইরের এলাকা। এখানে কেউ সেরকম অসুস্থ হয়ে পড়া মানে দুর্ঘটের একশেষ।

আমার কাছে ছোটখাটো একটা ফার্স্ট এইড বক্স সবসময় থাকতই। সেখান থেকে একটা ক্যালপল বের করে রাখলাম ওকে খাওয়াব বলে। মুশকিল হচ্ছে যে খালি পেটে ওষুধটা খাওয়ানো যাবে না। তাই বাইরে বেরিয়ে রেংতার উদ্দেশ্যে একটা হাঁক পাড়লাম, বললাম তাড়াতাড়ি খাবার বেড়ে দিতে। রেংতাও চটপটে লোক, আধঘণ্টার মধ্যে খাবার সার্ভ করে দিল। এই এতক্ষণ ধরে কিন্তু মহুয়া কিচ্ছুটি বলেনি, সেই যেরকম ছিল, সেইরকম ভাবে মাথায় হাত দিয়ে শুয়ে রইল।

সেই রাতে মহুয়া খেয়েওছিল খুব অল্প। আমরা ভাবলাম বুঝি সন্ধ্যেবেলা অতটা ঘুগনি খেয়েছে বলে খিদে নেই। সে যাই হোক, রেংতার বানানো ঝালঝাল ডিমের ঝোল আর ভাত খেয়ে যখন আঁচিয়ে উঠলাম, তখনই বাজে প্রায় রাত দশটা। সে-রাতে শীত পড়েছিলো জব্বর, দিব্যি ঠান্ডা ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল। আমরা খেয়ে-দেয়ে চাদর-টাদর জড়িয়ে বাংলোর সামনের বারান্দায় বসে আড্ডা দিচ্ছি। তার একটু পরেই এমন একটা ঘটনা ঘটে যা ওই শীতের রাতেও আমাদের ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল।'

এতটা বলে পিসি আমাদের দিকে বড়ো-বড়ো চোখ করে তাকিয়ে নিল একবার। দেখি এই এ.সি-র মধ্যেও পিসির কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। আমাদের কথা থাক, দেখি ভূতপ্রেত অলৌকিকে ঘোর অবিশ্বাসী আমার বাবা অবধি হাঁ করে পিসির প্রতিটি কথা গিলছে।

'আমরা বসে-বসে গল্প করছি, মানে আমি, মহুয়া, দীপাঞ্জন আর রেংতা। কথা অবশ্য আমরা তিনজনেই কথা বলছি, মহুয়া চুপ করে বসে ঝিমোচ্ছে। একটা ক্যালপল খাইয়ে দিয়েছি ওকে, আজকের রাতটার মতো নিশ্চিন্দি। দীপাঞ্জনকে বলে রেখেছি যে পরেরদিন সকালে মংলাদা এলে বরাভূম স্টেশনের বাজারে গিয়ে থার্মোমিটার কিনে আনতে। বেশি বাড়াবাড়ি হলে সোজা কলকাতা নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কী? এ-এলাকায় ডাক্তার পাওয়া আর ভগবান পাওয়া প্রায় একই ব্যাপার।

জানি না আগে বলেছি কি না, বারান্দায় এক কোনায় একটা দোলনা ছিল। শালকাঠের তৈরি মজবুত জিনিস, মোটা দড়ি দিয়ে বারান্দার সিলিঙে বাঁধা। দোলনাটা বারান্দার যেদিকে ছিল, তার উল্টোদিকে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম আমরা। আমরা আলোটালো সব নিভিয়ে দিতে বলেছি, ফলে সামনের দিকটায় চমৎকার একটা সিনারি তৈরি হয়েছে। আকাশে একটুখানি সাইজের বাঁকা চাঁদ। তার অল্প আলোয়, আবছায়া আর অন্ধকারে বাংলোর সামনেটা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে বুনো ফুলের সুবাস ভেসে আসছে, আর ভেসে আসছে রাতের জঙ্গলের শব্দ। এদিকে বাতাসে শীতের কামড় ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। আমাদের প্রত্যেকের গায়ে মোটা চাদর, আমি আর দীপাঞ্জন প্রায় গুটিসুটি মেরে বসে আছি, বেশ একটা ঠান্ডা-ঠান্ডা পরিবেশ। রেংতা ওদের গ্রামের কথা বলছিল, ওর ছেলেবেলার গল্প শোনাচ্ছিল আমাদের। আমরা বুঁদ হয়ে সেসব শুনছিলাম, মহুয়া একদিকে চুপচাপ বসেছিল।

ওদের গ্রামের নিশিতে পাওয়া লোক, ডাইনি ইত্যাদি নিয়ে নানারকম ভয়-ধরানো গল্প বলছিল রেংতা। কথা বলতে-বলতে হঠাৎ করে একবার চুপ করে গেলো ও, ঘাড় ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাইরের মেন গেটের দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা একটু অবাকই হলাম, আমি বললাম, 'কী হল গো রেংতা, চুপ করে গেলে যে?'

রেংতা সামান্য ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'উট্যা কে বট্যে?'

দীপাঞ্জন বিস্মিত গলায় বলল, 'কে? কার কথা বলছো?'

'দরজা খুইল্যে ঢুকলো কে? একবার দেখলাম মনে করল্যেম, আর দেখতে পেলমনি!'

এবার উঠতেই হয়। রাতবিরেতে বাংলোতে দরজা খুলে চোর-ডাকাত ঢুকলে সেটা মোটে ভালো কথা নয়। আমরা, মানে আমি আর দীপাঞ্জন ওই আলো আঁধারিতেই বাংলোর চারিপাশে বেশ খানিকক্ষণ ধরে খুঁজলাম, কিন্তু কোথায় কে? কই কোথাও কেউ নেই তো!

চারিধার দেখেটেখে চাদরমুড়ি দিয়ে বসেছি, রেংতা ফের ওর গল্প শুরু করতে যাবে, এমন সময় দেখি গায়ের চাদর খুলে সোজা হয়ে উঠে বসেছে মহুয়া, চোখ দুটো বড়ো-বড়ো হয়ে গেছে ওর, ঘন-ঘন শ্বাস ফেলতে-ফেলতে আঙুল তুলে বলে উঠল, 'ওই-যে, লোকটা!'

ওর আঙুল সোজা সেই দোলনাটার দিকে তোলা।

এবার আমরা বাকি তিনজনেও ওদিকে ঘাড় ঘোরালাম। এরপর যা দেখলাম সেটা ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়, বুঝলি। দেখলাম ওই আলো-আঁধারিতে দোলনাটা অল্প-অল্প দুলছে, ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠছে, আর তার মধ্যে দুলছে অন্ধকার রঙের একটা লোক !

কতক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিলাম জানি না, হাতেপায়ে কোনও সাড় ছিলো না। আমার মনে হচ্ছিলো আশেপাশে যেন আর কোনও শব্দ নেই, কোনও আলো নেই, কোনও এই বিশ্বচরাচরে আর কোথাও কিচ্ছুটি নেই। হাওয়া থেমে গেছে, দোলনার সেই ক্যাঁচকোঁচ শব্দ ছাড়া চারিদিকে বধির করে দেওয়ার মতো স্তব্ধতা। একটা মেঘ এসে চাঁদটাকে একবার ঢেকে দিয়ে ফের সরে যেতেই স্পষ্ট দেখলাম যে সেই লোকটার অবয়ব যেন আস্তে আস্তে জমাট বেঁধে আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আর যেন কতকাল ধরেই সে মানুষটা দোলনায় দুলছে, দুলেই চলেছে। তার আদি নেই, অন্ত নেই, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, ক্ষান্তি নেই। যেন কতকাল ধরে কোনও এক ভয়ানক জিঘাংসা বুকে পুষে রেখে সেই দোলনায় দুলে চলেছে সে। আধো অন্ধকারেও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার রোগা শরীরটা।

সেই বধির স্তব্ধতা ছাড়িয়ে, সব ছাপিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠছে ওর বুকের বাঁ-দিকে সেই কাটা দাগটা!

আর বুকে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে সেই আগুনে চোখ দুটো।

দু'হাত দিয়ে সে দোলনার দড়িটা ধরে আছে। অল্প-অল্প দুলছে দোলনাটা আর সেই অন্ধকারের লোকটা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

ভুল হল, আমাদের দিকে নয়, সে তাকিয়ে আছে শুধু মহুয়ার দিকে।

তার ঠোঁটের কোণে ঝুলে আছে একটা পৈশাচিক বাঁকা হাসি। যেন এক্ষুনি একটা রাক্ষুসে অট্টহাসি হেসে উঠবে সে, আর সেই ভয়াল অন্ধকার নরকের যাবতীয় অভিশাপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর।

এই প্রথম ভয় পেলাম আমরা, তীব্র ভয়। মহুয়া ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো, আমারও হাত পা সরছে না ভয়ে। রেংতা কী করছে দেখতে পাচ্ছি না, শুধু শুনতে পাচ্ছি দুর্বোধ্য সাঁওতালি ভাষায় কী-সব বলে চলেছে সে। একেকটা মুহূর্ত মনে হচ্ছে যেন এক এক যুগ। লোকটা কিছু করছে না। শুধু সেই শয়তানি হাসিটা সারা মুখে মেখে গনগনে কয়লার মতো লাল চোখ মেলে এই দিকে তাকিয়ে আছে।

এমন সময় উঠে দাঁড়ালো দীপাঞ্জন, সজোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে রে তুই? কী করে এলি এখানে? তোর সাহস তো কম নয়। যা, যা বলছি এখান থেকে...' বলে ছেড়ে রাখা চপ্পলের একটা পাটি তুলে ধরলো ছুঁড়ে মারবে বলে।

আর তারপরেই ঘটল ম্যাজিক। হঠাৎ যেন লোকটার



সারা দেহ গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গিয়ে সেই আধো-আঁধারির মধ্যে মিশে গেলো। ঘটনাটা এত চকিতে ঘটলো, যে আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব কিছু ফের আগের মতো! যেন একটু আগে কিছুই ঘটেনি এখানে!

মহুয়ার দিকে তাকিয়ে দেখি দেওয়ালের গায়ে ঢলে পড়েছে ও। দৌড়ে গিয়ে তুলতে যাবো, গায়ে হাত ঠেকতেই দেখি তীব্র জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ওর গা।

আর ওর সারা দেহ জুড়ে একটা বিচ্ছিরি মড়াপচা গন্ধ!

*

আমাদের প্ল্যান ছিল পরের দিনই যেভাবে হোক মহুয়াকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার। এখানে থাকলে এই জ্বর বেড়ে বেড়ে ও যে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে সেটা অনুমান করতে জ্যোতিষী হতে হয় না। আর তাছাড়া এই আধিভৌতিক পরিবেশে থাকতে আমাদেরও আর মন চাইছিল না। আমি আর দীপাঞ্জন চাইছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ভুতুড়ে জায়গা ছেড়ে কলকাতা ফিরে যেতে।

কিন্তু তাতে বাধ সাধলেন প্রকৃতি স্বয়ং!

সেইদিন মধ্যরাত থেকে নামল আকাশপাতাল ভাসানো মুষলধার বৃষ্টি। বাপ রে, এত বছর বয়েস হয়ে গেলো, সেই রাতের ঘোর বৃষ্টির কথা ভুলবো না। মনে হচ্ছিলো পুরো অযোধ্যা পাহাড়টা যেন গলে-গলে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। সেই সঙ্গে ঠা-ঠা করে পড়ছে বাজ আর বাইরে বইছে প্রবল ঝোড়ো হাওয়া। মাঝরাতে উঠে একবার জানালাটা খুলেছিলাম, দেখলাম যে বারান্দার ওপারে কে যেন জলের একটা মোটা পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছে, এমনই অবিশ্রান্ত সেই জলধারা। মনে হচ্ছিল বাংলোর ছাদে কেউ যেন পুরো পাঞ্চেৎ ড্যামটাই খুলে উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে। নেহাত ব্রিটিশ আমলে বানানো বাংলো, নইলে সেইরাতে আমাদের ভেসে যাওয়াও কিছু বিচিত্র ছিল না।

তবে বৃষ্টি নয়, আমাকে আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলো মহুয়ার শারীরিক অবস্থা। প্রচণ্ড জ্বর আর অসম্ভব পেট ব্যথায় মেয়েটা তখন কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে। মাঝরাতে উঠে আরেকবার ক্যালপল দিয়েছি। তাতে সাময়িক ভাবে জ্বর কমলেও পেট ব্যথার কোনও সুরাহা হওয়ার চিহ্নমাত্র নেই। ঘুমোতে পারছে না মেয়েটা। খানিকক্ষণ ঘুমোবার পরেই অস্ফুটে 'ওই, ওই এল, ওই এল আমাদের ধরবে বলে রে। ওই এল রে সাদাদের সেপাই...' এইরকম অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছে সে আর উঠে বসে উদভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক চাইছে। এসব দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে যে টেনশনে এবার আমিই অসুস্থ হয়ে পড়ব। এ কী অসুখ হল মেয়েটার? এই অজানা-অচেনা জায়গায় কিছু একটা হয়ে গেলে বিশ্বনাথকাকুর কাছে গিয়ে মুখ দেখাব কী করে? এ-সব পাগল করে দেওয়া চিন্তায় আমার মাথাটা কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। তার ওপরে সেই বিচ্ছিরি মড়াপচা গন্ধে আমার তখন পেটের ভাত উঠে আসার জোগাড়। দীপাঞ্জনও সেদিন আমাদের ঘরেই ছিল, দিদিকে ছেড়ে একফোঁটাও এদিক-ওদিক নড়েনি ছেলেটা, ঠায় বসেছিল দরজার কাছে।

অনেক কষ্টে শেষরাতে মহুয়াকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করলাম একবার। মাঝখানে একবার ভাবলাম এই ঘুমোল বুঝি। কিন্তু কোথায় কী? বিছানায় কোমরটা একটু ঠেকিয়েছি মাত্র, এমন সময় দেখি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই আর্তস্বরে চিৎকার করছে মেয়েটা, 'ও কারা এল, কারা এল রে! ওরে কুঠার বার কর, ওরা সাদাদের সেপাই, ওরে কে কোথায় আছিস... দৌড়ে আয় রে মরদের বাচ্চারা... আন টাঙ্গি... মার ওদের...'

গলাটা ওর নিজের নয়! আর ভাষাটাও বাংলা নয়... বাংলা মেশানো মানভূমের ভাষা!

ধড়মড় করে উঠে বসলাম আমি। দেখি দীপাঞ্জনও উঠে বসেছে। আমি ওর বিছানায় গিয়ে সোজা চেপে ধরলাম ওকে, আর আমার দুটো হাত যেন সঙ্গে-সঙ্গে জ্বলে গেল। দেখি তীব্র জ্বরে ওর সারা দেহ পুড়ে যাচ্ছে আগুনের মতো! সেই সঙ্গে কী যেন এক অজানা আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে মেয়েটা। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে, মুখের কোণ দিয়ে ঝরছে লালা। জানলা দিয়ে বয়ে আসা বৃষ্টিভেজা হাওয়ার দাপটে ডাইনির মতো উড়ছে ওর চুলগুলো। হাবেভাবে বিন্দুমাত্র মনে হচ্ছে না যে ও আমাদের চেনে আদৌ। উদভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে বারবার, কণ্ঠার হাড়টা ওঠানামা করছে তাঁতের মাকুর মতো। বড়ো-বড়ো শ্বাস ফেলছে মেয়েটা, চাদর আঁকড়ে ধরছে শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে। আমার মনে হলো একটা উন্মাদ শক্তি যেন ওর সারা শরীরে ভর করেছে। ওর দেহটা আর ওর বশে নেই...

তারপর যেটা হলো সেটার মতো ভয়াবহ আর কিছু হয় না!

গায়ের জোরে চেপেচুপে সব কিছু সামলে এনেছি মনে হচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ করে কী যেন হল, মনে হল কেউ যেন একটা বর্শা চালিয়ে দিয়েছে ওর পেট বরাবর। একবার ওঁক করে থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো মেয়েটা, চোখের মণিদুটো উলটে গেল, মাথাটা অল্প পেছনে ঝোঁকানো, ড্যাবড্যাব করে খোলা চোখদুটো জুড়ে শুধু চোখের সাদা অংশটা, আর তার ঠিক পরে-পরেই অন্য একটা ঘষা পুরুষালি গলায় ক্রুদ্ধস্বরে সাঁওতালি ভাষায় কী-সব যেন বলতে শুরু করল সে!

নির্জন জঙ্গলের মধ্যে প্রায়ান্ধকার সেই বাংলোটির বাতাস যেন শিউরে উঠল সেই ভৌতিক স্বর শুনে! সেই আওয়াজে আমার শিরদাঁড়া দিয়ে ভয়ের একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। এ কোন মহুয়া? এ কার গলা? এতদিনের চেনা মেয়েটার শরীরে ভর করেছে কোন অলৌকিক আতঙ্ক?

তবে শুধু এ-ই মাত্র নয়, তার সঙ্গে আবার এসে যুক্ত হল সেই তীব্র মড়াপচা গন্ধ। সেই অবর্ণনীয় কটুগন্ধে যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম আমি। মহুয়া তখন ওর পা দুটো বিছানায় আছড়াচ্ছে আর সাপের মতো দীর্ঘ হাত দিয়ে জাপটে ধরেছে আমাকে, আঁকড়ে ধরেছে আমার চুল আর পিঠের জামা। নখগুলো ছুরির মতো বিঁধছে আমার সারা গায়ে। আর সেই ভয় জাগানো অজানা পুরুষালি গলায়, সাঁওতালি ভাষায় কাকে যেন কিছু অভিশম্পাত করে চলেছে সে।

বুঝতে পারছি না, আমি জাস্ট বুঝতে পারছি না যে আমার কী করা উচিৎ!

এমন সময় অসাধ্যসাধন করলো দীপাঞ্জন। দৌড়ে এসে আমাকে একঝটকায় সরিয়ে দিয়ে নিজের দিদির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল ছেলেটা, 'দিদি রে, অমন করিস না রে দিদি। আমি তো আছি রে দিদি... অমন করিস না দিদি, অমন করিস না... আমার যে ভয় লাগে রে দিদি...' বলে দু'হাত দিয়ে সেই ছেলেটা হাউহাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে জড়িয়ে ধরল তার একমাত্র সহোদরাকে।

ভালোবাসার কী অপার মহিমা। চোখদুটো একবার বন্ধ করে খুলল মহুয়া, দেখলাম চোখের মণি আবার স্বস্থানে।

সেই লাল-লাল জ্বরচোখ মেলে মাত্র একবার দীপাঞ্জনের দিকে চাইল, আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল মেয়েটা। আমিও হাঁফ ছেড়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার অবসর পেলাম।'

*

'পরদিন ঘুম থেকে উঠে বুঝলাম যে আক্ষরিক অর্থেই অথৈ জলে পড়েছি। কাল রাতের বৃষ্টিতে চারিদিক জলে থৈ-থৈ করছে। বাংলোর চারিদিকে গোড়ালি অবধি জল। বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যাচ্ছে যে কাল রাত্রের বৃষ্টিতে অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গলের কী উথালপাতাল অবস্থাটাই না হয়েছে। আকাশ যদিও পরিষ্কার, কিন্তু বাতাসে শীতের কামড় বড়ো তীব্র হয়ে উঠেছে এই একরাতেই। রেশন যা এনেছি তাতে হয়তো আরও দিন দুয়েক চলে যাবে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে মহুয়াকে নিয়ে বরাভূম স্টেশন অবধি পৌঁছব কী করে?

সকালবেলা মহুয়াকে তুলতে গিয়ে দেখি একরাত্রেই মেয়েটার শরীর যেন ভেঙে পড়েছে আরও। নিঃসাড় আর নির্জীব মেয়েটার লালচে ঘোলাটে দু'চোখে ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি, রুখুসুখু চুলগুলো উড়ছে পাগলির মতো। তবে যে জিনিসটা দেখে আরও ঘোর চিন্তায় পড়ে গেলাম সেটা হচ্ছে মহুয়ার হাতের আঙুল আর নখ। এই একরাতেই অমন চাঁপাকলির মতো আঙুল আর সযত্নে ম্যানিকিউর করা নখগুলো শুকিয়ে যেন কালো দড়ির মতো হয়ে গেছে। দেখলে মনে হচ্ছে যে চাপচাপ কালশিটে পড়েছে দুই হাত জুড়ে। অমন সুন্দর হাত দুটোর দিকে চাইতে আমার ভয়ই করছিল।

সকালে মহুয়াকে অতি কষ্টে একটা ব্রেড জ্যাম দিয়ে গিলিয়েছি। মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। জ্বর, কষ্ট, এসব বাদ দিয়েও বোঝা যাচ্ছিল যে পেটের অসহ্য ব্যথাটা পাগল করে তুলছে ওকে, ওর গায়ে আর কষ্ট সহ্য করার কোনও শক্তিই অবশিষ্ট নেই। ওকে দেখে আমার থেকে থেকে চোখ ফেটে জল আসছিলো।

সকাল সকাল মংলাদা এসে গেছিল। ওর মুখেই শুনেছিলাম রাস্তায় পড়ে থাকা গাছের ডালপালা, মরা কুকুর বেড়াল আর পাখির ছানা ইত্যাদি সরিয়ে কত কষ্টে আজ আসতে পেরেছে সে। পুরুলিয়াতে এরকম বৃষ্টি নাকি বহুদিনের মধ্যে কেউ দেখেনি। গ্রামের দিকে অবস্থা নাকি আরও খারাপ। অনেক বাড়ির মাটির দেওয়াল ধসে পড়েছে, মারা গেছে হাঁস-মুরগি-ছাগল। সাপের কাটায় মারা গেছে একজন, গাছের ডাল মাথায় পড়ে আহত বেশ কিছু। এখনও অনেক জায়গাতেই জল জমে আছে।

দীপাঞ্জন ব্রেকফাস্টের নামে নাকেমুখে দুটো গুঁজেই মংলাদা-কে নিয়ে বেরিয়ে গেছিল বরাভূম স্টেশনের দিকে, কলকাতাগামী যে কোনও ট্রেনের তিনটে টিকেট কাটার জন্যে। কিন্তু বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওরা যখন ফিরে এল তখন বুঝলাম যে পরিস্থিতি যতটা ভেবেছিলাম তার থেকেও অনেক খারাপ। কাল রাতের প্রবল বৃষ্টিতে অনেক জায়গায় লাইনের ওপর জল জমে গেছে, ট্রেন চলাচল আপাতত বন্ধ। অনেক ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। আশা করা যাচ্ছে, বিকেলের দিকে জল নেমে গেলে ট্রেন চলাচল আবার স্বাভাবিক হবে। তবে সে-ও কথার কথা, মানে হলে হবে, এইমাত্র। তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

কথাটা যে আমাদের খুবই চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল সেটা বিস্তারিত না বললেও চলে। আমার টুটাফুটা কাজ চালানো গোছের ফার্স্ট এইড, আর বরাভূম স্টেশনের মেডিসিন স্টোর থেকে কিনে আনা কিছু ব্যথা কমানোর ওষুধ, এই নিয়ে মেয়েটার কতটাই বা আর চিকিৎসা করা যায়? স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র একেই এখান বেশ খানিকটা দূর, তার ওপরে সেখানে কীরকম কী চিকিৎসা পাওয়া যাবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। আর তার থেকেও সবচেয়ে বড় কথা হল যে রাস্তার যা অবস্থা, তাতে মেয়েটাকে ওই অবস্থায় গাড়ি করে কোথাও নিয়ে যাওয়া আর কংসাবতীতে হাত পা বেঁধে ফেলে দেওয়া একই ব্যাপার। ফলে ট্রেনের জন্যে বুকে পাথর বেঁধে অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কী?

দুপুর নাগাদ মনে হল এ-যাত্রা বোধহয় মেয়েটাকে আর বাঁচানো গেল না। একশো তিন ডিগ্রী জ্বর আর অসহ্য পেটব্যথার সঙ্গে শুরু হল রক্তবমি। যেমন বীভৎস তার রং, তেমনই উৎকট তার দুর্গন্ধ। ওকে সামলাতে গিয়ে আমারই বমি হল বারদুয়েক। বমিটমি করে আরও নেতিয়ে গেল মেয়েটা। তখন আমার বুক ফাটিয়ে কান্না আসছে, মেয়েটা এবার সত্যিই বোধহয় মরে যাবে। অমন ঠান্ডা মেজাজের হাসিমুখের রেংতা অবধি হতভম্ব হয়ে পড়েছে, সে-ও বুঝতে পারছে যে একটা কঠিন অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা বাংলোর ওপর কালো ডানা মেলে নেমে আসছে।

একটা ব্যথার ওষুধ খেয়ে সামান্য শুয়েছে মেয়েটা, আমি আর দীপাঞ্জন দু'জনে কাহিল হয়ে বসে আছি সামনের বারান্দায় আর আলোচনা করছি যে কখন ট্রেন চলাচল চালু হতে পারে, আর চালু হলে কী করে স্টেশন অবধি মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়া যাবে, এমন সময় শুনি গেটের বাইরে টেম্পোর প্যাঁ-পোঁ আওয়াজ।

এ আওয়াজ আমার খুব চেনা। এটা বুধনদা-র টেম্পোর আওয়াজ।

আমি তো লাফিয়ে উঠেছি, আর হয়েছি তেমনই আশ্চর্য! এই এত বৃষ্টির পরেও, এইরকম অবস্থার মধ্যে লোকটা এল কী করে? তবে প্রথমেই যেটা মাথায় এল সেটা হচ্ছে যে বুধনদা হল গিয়ে এই এলাকার বহু পুরোনো লোক। কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে নিশ্চয়ই। ডুবন্ত মানুষ যেভাবে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, ঠিক সেইভাবে আমি আর দীপাঞ্জন প্রায় পড়িমরি করে দৌড়ে গেলাম গেটের দিকে। একবারও ভাবলাম না যে আধবয়েসী সাঁওতাল বুড়ো এত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে কেন এসেছে আমাদের

দেখতে।"

'কেন দীপুদি?' ছলছল চোখে মায়ের প্রশ্ন। আমার মা একটু অল্পেই কেঁদে ভাসাতে পছন্দ করে। দীপুপিসিও সেটা জানতেন, তাই প্রশ্নটা শুনে মৃদু হাসলেন তিনি, তারপর বললেন, 'বলছি, সবই বলছি। তার আগে একটা পান দে তো রে স্যান্ডি।'

আজকের বোধহয় এটা পঞ্চম বা ষষ্ঠ পান হল দীপুপিসির। স্যান্ডি আড়ালে আমার দিকে প্রশ্নাতুর চোখে চাইল, অস্যার্থ, আজ কি আরও পান কিনে আনতে হবে?

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আর গিয়েই দেখি আরেক চমক, বুধনদা একা আসেনি! এই ঘোর সঙ্কট-সময়ে সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে আরও দু'জনকে!

সেই দু'জনেই অবশ্য এখানকার লোক। পরনে যদিও বাহারি শহুরে পোশাক, দেখলেই বোঝা যায় যে তারা কলকাত্তাই আদবকায়দায় অভ্যস্ত। তাদের দেখে তো আমি যেমন অবাক তেমন বিব্রত। মহুয়ার এই অবস্থায় কোনও গেস্টকে এন্টারটেইন করার কথা আমি ভাবতেই পারি না। আর এতসব বৃষ্টিবাদল পেরিয়ে এখানে এরা এল কেন? কী ভাবে? আর কেনই বা এলো?

আহা, তখন যদি জানতাম যে শেষতক এদেরই একজন আমাদের দুঃখত্রাতা শ্রীমধুসূদন হয়ে দাঁড়াবে!

তাদের মধ্যে যাকে দেখেই দীপাঞ্জন দৌড়ে গেলো জড়িয়ে ধরবে বলে, তার নাম জোশুয়া, জোশুয়া হেমব্রম। পরে শুনলাম যে ছেলেটা ওর কলেজের বন্ধু। আর সঙ্গের ছেলেটা জোশুয়ার দাদা পিটার, পিটার হেমব্রম। দীপাঞ্জনই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো আমাদের। ওর মুখেই শুনলাম যে পিটার আর. জি. কর-এ ডাক্তারি পড়ত। সবে পাশ করেছে, হাউস সার্জেনশিপ শুরু।'

'এই কি সেই পিটার হেমব্রম যার কথা তুমি প্রথমে বলেছিলে? সেই যার পারিবারিক গল্পগাথা শুনে...' কম কথা বললে কী হবে, অরিজিৎ ওরফে অ্যারির মেমরি যে অত্যন্ত শার্প সে-কথা মানতেই হবে।

বেশ খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়লেন পিসি। মনে হলো কী যেন একটা মনে করার চেষ্টা করছেন। তারপর ফের বলতে শুরু করলেন।

'আমরা ওদের নিয়ে বারান্দায় এসে বসতেই রেংতা কোথা থেকে উদয় হয়ে হাঁউমাঁউ করে সাঁওতালি ভাষায় কী সব বলতে লাগল, আমরা তার বিন্দুবিসর্গ বুঝলাম না। শুধু বুঝলাম যে বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোর অবস্থা দেখে সে ভারি চিন্তিত হয়ে পড়েছে, এবং সে আশা করছে যে এইবার কিছু অন্তত সুরাহা হবে। রেংতাকে একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে বলে আমরা পুরো ব্যাপারটা খুলে বলা শুরু করলাম। আমাদের সমস্ত বিপদ বিস্তারিত ভাবে বলতে লাগল ঠিক চার মিনিট। আর ছ'মিনিটের মাথায় পিটার লেগে পড়লো মৃতপ্রায় মহুয়ার চিকিৎসা করতে। এখানে বলে রাখি যে পিটার তার ডাক্তারি ব্যাগটি নিয়ে আসতে ভোলেনি। ঘরের ভেতর পিটার উদ্বিগ্ন মুখে মহুয়ার পরিচর্যা করছে, আর বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জোশুয়া বলতে লাগল যে ঠিক এখনই এরা এখানে এল কী করে।

আগেই বলেছি যে দীপাঞ্জন বেশ খানিকটা কসরৎ করেই এই বাংলোতে তিনদিন থাকার অনুমতি জোগাড় করেছিল। এই জোশুয়া হচ্ছে দীপাঞ্জনের ক্লাসফ্রেণ্ড, আর জোশুয়ার বাবা স্টেট ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের উচ্চপদস্থ করণিক। জোশুয়ার বাবাকে ধরেই যে এই মহার্ঘ অনুমতিটি আদায় হয়েছিল সেটা আন্দাজ করতে বেশি কষ্ট করতে হয় না। আর এই জোশুয়ার দেশের বাড়ি বা গ্রামের বাড়ি, সেটা আবার আমাদের বুধনদা-র গাঁয়ে। এরা দুইভাই হঠাৎ পাওয়া একটা এক্সটেন্ডেড উইকেন্ডের ছুটি কাটাতে এসেছিলো গ্রামের বাড়িতে। আর এসে দেখে এই বিপর্যয়!

কাল রাতের প্রবল বৃষ্টি দেখে বুধনদা-ও যেমন চিন্তিত হয়েছে আমাদের কী হাল হল সে নিয়ে, এরাও তেমনই, কারণ জোশুয়া জানতোই যে আমরা কোথায় আছি। দুপুরের দিকে জল একটু সরতে দেখে যেই না বুধনদা টেম্পো নিয়ে বেরিয়েছে এখানে আসবে বলে, এরাও বেরিয়ে পড়েছে সঙ্গে-সঙ্গেই। গ্রামেগঞ্জে সবাই সবার খবর রাখে, ফলে বুধনদা কোথায় কেন যাচ্ছে সে-সব জানতে আর তক্ষুনি তক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি ওদের। ওদের গ্রাম থেকে এখানে আসতে-যেতে প্রায় দু'ঘণ্টার রাস্তা। সেটা আজকে পেরোতে ওদের লেগেছে পাঁচঘন্টার কিছু বেশী। এত কষ্ট স্বীকার করেও এরা কেন এসেছিল জানিস?'

'কেন পিসি?' মৌয়ের ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলা দিয়ে ওর থেকে জোরালো আওয়াজ বেরোনো বোধহয় আর সম্ভব ছিল না। পিসি কিন্তু রাগ করলেন না, কিছু উত্তরও দিলেন না। আনমনে কী একটা ভেবে ফের বলতে লাগলেন।

'মহুয়ার চিকিৎসা হওয়ার সময় পিটারের হাবভাব দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে ঈশ্বরের এই অযাচিত আশীর্বাদও বোধহয় বিফলেই গেল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একজন মানুষ যে এরকম শুকিয়ে যেতে পারে, সেটা মহুয়াকে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। মনে হচ্ছে যেন বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে মেয়েটা। পেটের অসহ্য যন্ত্রণা দাঁতে দাঁত চেপে সয়ে নিয়ে খাটের এক কোণে নিঃসাড়ে পড়ে আছে সে। চোখের কোণে একপোঁচ কালি, নখগুলো বীভৎস কালো হয়ে আছে। একরাতেই অমন মোটাসোটা হাতের শিরা বেরিয়ে এসেছে। বেশ অনেকবার নাম ধরে ডাকলে তবে অতি কষ্টে একবার চোখ খুলে ক্ষীণ গলায় সাড়া দিচ্ছে। সারা দিন মুখে কুটোটি কাটেনি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ বা বাকি

খাওয়া-দাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শ্বাস উঠছে আর নামছে অতি ধীর। মোটমাট মেয়েটা বেঁচে আছে কি না বুঝতেও কষ্ট লাগে।

দীপাঞ্জনের দিকে চোখ ফেরানো যাচ্ছিল না। দেখে মনে হচ্ছে অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে রেখেছে ও। আমারও কি চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল না? যার বাবা বারাসাত থেকে শুরু করে বসিরহাট অবধি সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডাক্তার, লোকে যাঁর নামে বলে কোনও রোগীর ব্যাপারে বিশ্বনাথ ডাক্তার হাত দিয়েছে শুনলে স্বয়ং যমরাজও দু'বার ভাবেন, তাঁরই মেয়ে বাংলাদেশের এক অজানা-অচেনা কোণে দৈবদুর্বিপাকে, প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে বসবে সে কথা কে-ই বা ভেবেছিল?

পিটার ওর সঙ্গে থাকা কিট থেকে যন্ত্রপাতি বের করে অনেক কষ্টে কিছু পরীক্ষা-টরিক্ষা করল। ওর কপালের গভীর ভাঁজ দেখেই বুঝেছিলাম যে অবস্থা জটিল। আমাকে বাইরে ডেকে পিটার বলল, 'খুব সিভিয়ার ইনফেকশন। শরীরের অবস্থা ভালো নয়। হার্টবিট একশোর ওপরে। ব্লাড প্রেশার সিক্সটি বাই ফর্টি। যে কোনও মুহূর্তে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে। কিন্তু...' এই বলে ভ্রূ কুঁচকে কী যেন একটা ভাবতে লাগল পিটার।

'কিন্তু কী?' জিজ্ঞেস করতেও আমার বুক কাঁপছিল।

'তার সঙ্গে আরও কিছু একটা আছে যেটা ধরতে পারছি না। আরও বেশ কিছু টেস্ট দরকার, সে-সব কলকাতার ফেসিলিটি ছাড়া করানো অসম্ভব। আমার সিনিয়রকে একবার আনতে পারলে...' এই বলে ভ্রূ কুঁচকে আরও দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটি। তারপর বলে, 'জোশুয়াকে একটু কাছেই এক জায়গায় পাঠাচ্ছি, কয়েকটা জিনিস আনার জন্যে। আমার যেন কেমন অন্য একটা সন্দেহ হচ্ছে।'

'কী সন্দেহ পিটারদা?' জিজ্ঞেস করে দীপাঞ্জন।

পিটার প্রথমে কিছু বলে না। বারান্দায় চুল এলিয়ে বসে থাকা মুখভার কিশোরীটির মতো বিষণ্ণ সেই অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে থাকে সে। তারপর বলে, 'জানি না কথাটা আপনাদের বলা ঠিক হচ্ছে কি না। আপনারা শহুরে লোক, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। আমিও যদিও তাই, কলকাতা শহরে ডাক্তারি পড়েছি, নিজেকে অশিক্ষিত বলি কী করে? কিন্তু যে কথাটা এখন না বলে পারছি না, সেটা হচ্ছে যে আমার মতে, এখন এখানে এমন কিছু একটা ঘটছে, যেটাকে আমাদের চেনাজানা জগতের বাইরের ঘটনা বলা ছাড়া এক্সপ্লেইন করা যায় না। জানি এই কথাটা শুনে হয়তো আপনারা আমাকে অশিক্ষিত গাঁইয়া ভূত ভাববেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটা বোধহয় আমাদের চেনা পৃথিবীর জাগতিক নিয়মকানুনের বাইরের অতিলৌকিক কিছু একটা ব্যাপার। আমার পুঁথিগত শিক্ষা দিয়ে অনেক কিছুর ব্যাখ্যা পাচ্ছি না। কোনও ইনফেকশন, সে যতই মারাত্মক হোক না কেন, একদিনের মধ্যে রুগীকে এই অবস্থায় নিয়ে আসতে পারে না। আরও অনেক টেকনিক্যাল টার্ম বলতে পারি, যেগুলো বললে হয়তো আপনারা বুঝবেন না। তারা কিন্তু যা ইঙ্গিত করছে, তাতে আমার বিশ্বাসটাই বদ্ধমূল হচ্ছে।'

'কী বলতে চাইছ সেটা একটু খুলে বলবে পিটারদা?' ভেজা গলায় জিজ্ঞেস করল দীপাঞ্জন।

'দ্যাখ ভাই, সোজা কথা বলছি, আমার মনে হচ্ছে তোর দিদির যা অবস্থা দেখছি, তাতে এটা কোনও স্বাভাবিক ইনফেকশন বা সেইরকম কিছু ভাবতে আমার অসুবিধা আছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বেশ কিছু প্যারামিটার এতটাই নেমে গেছে যে কারেন্ট মেডিক্যাল সায়েন্স দিয়ে সে-সব এক্সপ্লেইন করা যাচ্ছে না। আমার কাছেও এই মুহূর্তে এমন কোনও ডেটা বা রিপোর্ট নেই যা দিয়ে আমি এগুলো ব্যাখ্যা করতে পারি। কলকাতা গেলে হয়তো সে-সব সম্ভব হতো। কিন্তু এঁর যা অবস্থা, তাতে ট্রেন ছাড়া অন্য কোনওভাবে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবাটাই অসম্ভব। আমার কাছে এখন চ্যালেঞ্জ নেক্সট তিন থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে এঁকে অন্তত কলকাতা যাওয়ার মতো সুস্থ করে তোলা। নইলে যে রেটে ভাইটাল সাইনগুলো ফল করছে তাতে এই রাতটা কাটা মুশকিল। আমার বিদ্যায় এমন কোনও ওষুধ নেই যা এই অসাধ্যসাধন করতে পারে। এক যদি না....।'

আমি ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'এক যদি না কী?'

আমার আর দীপাঞ্জনের দিকে একবার বড়ো-বড়ো করে চোখ মেলে তাকাল সেই নবীন ডাক্তারটি, তারপর গলাটা খানিকটা নিচু করে গাঢ়স্বরে বলল, 'একটা শেষ চেষ্টা করে দেখছি দীপান্বিতা, জানি না সফল হব কি না।'

'কী চেষ্টা পিটারদা?'

'আমাদের পরিবারে কিছু চালু আদিম চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন আছে, বুঝলে। এসব চিকিৎসার কথা আমাদের ফ্যামিলি ছাড়া আর কোনও সাঁওতাল জানে না। সে-সব চিকিৎসার কথা শুনলে হয়তো তোমরা মানবে না, হেসেই উড়িয়ে দেবে। এইসব চিকিৎসা পদ্ধতি বেশ কয়েক হাজার বছরের পুরোনো। বংশানুক্রমে এসব গুপ্তবিদ্যার স্রোত বয়ে চলেছে আমাদের ফ্যামিলিতে। আমি জেনেছি আমার বাবার কাছ থেকে। তিনি জেনেছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। বাড়ির ছেলেরাই একমাত্র এই জ্ঞানের ন্যায্য অধিকারী হয়। এ-বিদ্যা আমি জানি, জোশুয়ার এসবে ইন্টারেস্ট নেই, তাই ও বেশি কিছু জানে না, শুধু উপাদানগুলো চেনে।

এই চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে আছে বেশ কিছু মন্ত্র আর ওষুধ। সব ওষুধই হার্বাল, মানে এই জঙ্গলেই পাওয়া যায় এমন লতাপাতা দিয়ে তৈরি। জানি তোমরা শুনলে হয়তো নাক সিঁটকোবে, আমাকে গেঁয়ো ভূত ঠাওরাবে। কিন্তু ছোটবেলায় আমার বাবাকে দেখেছি এইসব ওষুধপাতি দিয়ে অবিশ্বাস্য সব ভেলকি দেখাতে। শ্মশানের পথে রওনা দেবে-দেবে করছে, এমন লোককেও দেখেছি বাবার দেওয়া ওষুধ দু'ফোঁটা খেয়ে উঠে বসতে।

তারই কিছু-কিছু বিষকাটানের ওষুধ আর মন্ত্র-টন্ত্র আমার বাবা আমাকে শিখিয়ে গেছিলেন। আজ তারই মধ্যে

আমার জ্ঞানমতে সবচেয়ে সাংঘাতিক, সবচেয়ে জটিল যে ওষুধটি, তারই মালমশলা আনতে পাঠিয়েছি জোশুয়াকে। যদি আমার ছোটোবেলায় শেখা বিদ্যা একেবারে ব্যর্থ না হয়ে থাকে, তবে আশা করি অন্তত কয়েকঘণ্টা এঁকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারব, সে যতবড় বিষক্রিয়াই হোক না কেন।' খুবই গম্ভীর আর উদ্বিগ্ন শোনাচ্ছিল পিটারের গলার স্বর।

আমার সব কিছু ফের গুলিয়ে গেল। কে কোথাকার ডাক্তার, কার্যগতিকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, তার মুখে এসব হাজার বছরের পুরনো কোন 'বিষকাটানের ওষুধ" এর কথা শুনছি? এসব তুকতাক বিষয়ে আমার কোনওদিনই কোনও ইন্টারেস্ট ছিলো না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কী করা উচিৎ সেটা একদমই বুঝতে পারছি না!

দীপাঞ্জন এবার হাউহাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'যা খুশি করো পিটারদা, শুধু আমার দিদিকে একবার বাবার কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। দোহাই তোমার, কলকাতায় নিয়ে চলো আমার দিদিটাকে। আমি জানি বাবা একবার আদর করে ডাকলেই ও উঠে বসবে...'

আমার এসবে কান ছিল না বিশেষ। আমার কাছে আর কোনও অপশনও ছিল না। আমি শুধু একটা খটকা ক্লিয়ার করে নিতে চাইছিলাম। পিটারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু একটা কথা বল পিটারদা, তুমি বা তোমার বাবা বা তাঁর বাবা ছাড়া সাঁওতালদের মধ্যে এই ওষুধ কেউ বানাতে পারে না বললে না? কিন্তু কেন?'

মৃদু হেসে একবার আমার দিকে তাকালো পিটার। তারপর শান্ত চোখে বললো, 'তার কারণ হচ্ছে যে আমরা আসলে হেমব্রম নই, আমারা জাতে বেদিয়া। আমি সাঁওতালদের মধ্যে শেষ বেদিয়া পরিবারের বংশধর।!"

এই বলে চুপ করে গেলো পিটার। ব্যাপারটা ঠিক করে বোঝার আগেই রেংতা আর মংলাদা এসে আমাকে বারান্দার একদিকে টেনে নিয়ে এল। ওদের মুখচোখ দেখেই বুঝলাম যে দু'জনে কিছু একটা প্ল্যান করেছে, দু'জনেরই গম্ভীর মুখে খেলা করে বেড়াচ্ছে একটা চাপা উত্তেজনা।

*

এতটা বলে পিসি একটু থামলেন, জল খেলেন। তারপর গলাটা একবার পরিষ্কার করে ফের শুরু করলেন।

'ওদের কথা শুনে বুঝলাম যে গতকাল রাতে বারান্দায় সেই ভয়াবহ আবির্ভাবটির ব্যাপারে রেংতা আমাদের মংলাদাকে যথেষ্ট ভালভাবেই অবহিত করেছে। তার সঙ্গে অতর্কিতভাবে মহুয়ার এতটা শরীর খারাপ হওয়াটা ওরা ঠিক স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারছে না। ওদের মতে এ-সব ঠিক স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এর পেছনে নাকি তাঁরা আছেন।

'তাঁরা কারা?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'দেও-রা। বোঙ্গারা। ওঁরা রাগলেই এইরকম সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটে। তখন ভালোমানুষদেরও অমন কষ্ট পেতে হয়। দোহাই দিদি, আমাদের কথা শুনে তুমি একটিবার ভৈরবীমায়ের থানে চলো। মৌদি-র এতো কষ্ট আর দেখা যায় না যে। একটি বার আমাদের কথা শোনো দিদি, যদি ভালো হয়? ক্ষতি তো কিছু নেই, দোহাই দিদি, তুমি আমাদের সঙ্গে একটিবার চলো।'

'কী জানিস, ওইরকম একটা পরিস্থিতিতে, অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গলঘেঁষা সেই পুরোনো ব্রিটিশ আমলের বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল। সে তোরা আমাকে ভীতু, বা কুসংস্কারগ্রস্ত বা অন্যকিছু বলতে পারিস, কিন্তু সেইখানে দিশেহারা অবস্থায়, ওইরকম পরিস্থিতিতে আমার মাথা আর কাজ করছিল না। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল এই লোকদুটো যা বলছে তা সত্যি হলেও হতে পারে!

ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'কার কথা যেন বললে, কোন মা না কী যেন, ওখানে গেলে কোনও সুরাহা হতে পারে বলছ?'

দু'জনেই যেন একটু শিউরে উঠল কথাটা শুনে, মংলাদা তো হাতদুটো নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথায় ঠেকিয়ে নিল একবার। রেংতা বলল, 'অমন বোলো না দিদি, ভৈরবীমা সাক্ষাৎ দেবী গো। ভূতপ্রেত-দত্যিদানো সব্বাই মায়ের আঁচলে বাঁধা থাকে যে। নইলে গেল মাসে বলরাম মাহতোর প্রায় মরে যাওয়া মেয়েকে সারিয়ে তোলা কী যার তার কম্মো গো দিদি?'

দু'জনে আরও অনেক আগড়ম বাগড়ম বকে যাচ্ছিলো। অতি কষ্টে সেসব থামিয়ে দু'জনের ভক্তিপ্রণত প্রলাপ শুনে যেটা উদ্ধার করলাম সেটা হচ্ছে যে এই ভৈরবী মা তান্ত্রিক বা তন্ত্রবিদ গোছের কোনও সাধিকা কেউ। বেশিদিন হল এখানে আসেননি, কিন্তু এর মধ্যেই খুবই জনপ্রিয় হয়ে পড়েছেন স্থানীয়দের কাছে। এখানকার বেশ কয়েকজনের রোগবালাই সারিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথা শুনে অনেক পরিবারের উপকার হয়েছে। রেংতার মতে বনের পশুপাখিরা অবধি নাকি ওঁর কথা শুনে চলে। স্বচক্ষে দেখেছে রেংতা, মা বসে ধ্যান করছেন আর বনের পাখিরা চুপটি করে মায়ের পাশে বসে আছে। মায়ের চলার পথে হাতি ঠাকুর পড়লে নাকি, যা এখানে হামেশাই হয়ে থাকে, সে অবধি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়। মোটমাট বোঝা গেল এখানকার লোকেদের দৃঢ় বিশ্বাস মা বিশেষ দৈবী শক্তির অধিকারী। তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লে কিছু না একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

খানিকক্ষণ ভেবে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যেতে হবে? কত দূরে?'

ভাবছিলাম যাওয়াটা ঠিক হবে কি না। আরও ভালো করে বলতে গেলে, গিয়ে কোনও লাভ আছে কি না।

অন্যমনস্ক হয়ে একবার আমাদের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

আমার চোখ পড়ল বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশে যাওয়া মহুয়ার মুখের দিকে। তারপর আর ভাবিনি। রেংতাকে আর দীপাঞ্জনকে মহুয়ার কাছে রেখে আমি বুধনদা আর মংলাদা'র সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

*

'সেই মায়ের থানে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন ঘোর সন্ধে। কী করে যে সেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে বনবাদাড় পেরিয়ে ভৈরবী মায়ের কাছে পৌঁছলাম সে কথা জিজ্ঞেস করিসনি, সে আমার মনেও নেই। তবে পরেও দেখেছি যে ঘোর বিপদের মুখে আমরা এমন সব কাজ করে ফেলতে পারি, যেটা হয়তো স্বাভাবিক অবস্থায় করার কথা চিন্তাই করতে পারতাম না। বুধনদা আর মংলাদা না থাকলে যে ওই জায়গায় যেতে পারতাম না সে কথা বলাই বাহুল্য। ওরা জঙ্গলের লোক, হাতের তালুর মতো চেনে জায়গাটাকে।

শেষমেশ যেখানে এসে উপস্থিত হলাম সেটা অযোধ্যা পাহাড়ের, যাকে বলে পাদদেশ, সেইরকম একটা জায়গায়। একটা ছোট শুঁড়িপথ ধরে হ্যাঁচোর-প্যাঁচোর করে উঠে এসে দেখি একটা বেশ বড়ো চাতাল, আর তার সামনে একটা ছোটো গুহা মত। সঙ্গী দু'জনের প্রণামের ঘটা দেখে বোঝা গেল ভৈরবীমা এখানেই থাকেন।

দু'জনে খানিকক্ষণ ইতস্ততভাবে মৃদুস্বরে ডাকাডাকি করা শুরু করার মিনিটখানেকের মাথায় গুহার মুখে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

সঙ্গে-সঙ্গে বুধনদা আর মংলাদা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে মা-কে বোঝাতে লাগল কেন সন্ধের পর মায়ের কাছে আসা বারণ থাকা সত্ত্বেও আজ ওরা আমাকে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। একটা নির্দোষ মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই যে এটা করা সে কথাও বার-বার বলতে লাগল দু'জনে।

আমি ভৈরবীমায়ের দিকে চেয়ে ছিলাম। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে ইনি এদিককার লোক নন। উচ্চতায় খুব বেশি হলে পাঁচ ফুটের একটু ওপরে। দোহারা চেহারা, পরনে গেরুয়া শাড়ি। মাথায় একঢাল চুল জটা বেঁধে আছে। তবে আমাকে সবচেয়ে বেশি যেটা আকর্ষণ করল সেটা হচ্ছে ওঁর মুখশ্রী। একটা অদ্ভুত প্রশান্তি ছেয়ে আছে সারা মুখে। সেখানে কোনও কষ্ট, কোনও দুঃখ, কোনও চিন্তা বা উদ্বেগের চিহ্নই নেই। দেখলেই বুকের ভেতরটা কেমন ঠান্ডা হয়ে যায়। বুধনদা আর মংলাদা-র কথা শুনেটুনে হাতের ইঙ্গিতে ভৈরবীমা আমাদের ভেতরে আসতে বললেন। আমরাও ওঁর পেছন-পেছন একটু মাথা নিচু করে গুহায় ঢুকে পড়লাম।

গুহার ভেতরে গিয়ে দেখি তেমন সরঞ্জাম কিছুই নেই। একটা বড়ো মাটির প্রদীপ জ্বলছে একপাশে, আর একপাশে একটা মাটির কলসী, বোধহয় জল খাওয়ার জন্য। কলসীর মাথায় একটা সরা, তার ওপরে একটা অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো গ্লাস। কলসীর পাশে কিছু ফলমূল ডাঁই করে রাখা, বোধহয় এলাকার লোকজনেরা ভালোবেসে দিয়ে গেছে। আমার চোখ পড়ল মেঝেতে পেতে রাখা জীর্ণ, কিন্তু মস্তবড় বাঘছালটার ওপর। আমি ওদিকে তাকিয়ে আছি দেখে অল্প হাসলেন উনি, তারপর দেহাতী হিন্দিতে বললেন, "ওটা আমার গুরুজীর, অমৃতলোকে যাত্রা করার সময় আমাকে দিয়ে যান। উনি পেয়েছিলেন ওঁর গুরুজীর কাছে।" এই বলে মাথায় হাত ঠেকালেন। আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠ ওঁর। অনেকটা মহুয়ার মতো... বড়ো ভালো গায় মেয়েটা...

মহুয়ার কথা মনে পড়তেই ছটফট করে উঠলাম। আহ, কীসব ফালতু কথায় সময় নষ্ট করছি আমি, আর ওদিকে মেয়েটা কী কষ্টটাই না পাচ্ছে। কী জানি, এতক্ষণে ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে গেল কী না। ভাবতেই আমার চোখ ফেটে জল আসছিল।

ভৈরবী মা বোধহয় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিলেন আমার মনের অবস্থাটা। ইঙ্গিতে বসতে বললেন আমাদের তিনজনকে। তারপর আমাকে বললেন, 'ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে সেটা একটু বিস্তারিত বলবি? কিচ্ছু বাদ দিবি না কিন্তু।'

আমি বলতে শুরু করলাম সেই কলেজ স্ট্রীটের ঘটনাটা থেকে। তারপর আমাদের পুরুলিয়া আসা থেকে শুরু করে গতকালের ঘুগনি খাওয়া হয়ে মহুয়ার অসুস্থ হয়ে পড়া অবধি বলতে সময় লাগল প্রায় দশ মিনিট।

তারপর চারজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম। বাইরে ঝিঁঝিঁপোকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো। আর শোনা যাচ্ছিলো জঙ্গলের রাতের শব্দ। নিশ্চুপ নিস্তব্ধ সেই কয়েকটা মুহূর্ত আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যেন অনন্ত সময়।

'বুধন।' সেই নৈঃশব্দ খান-খান করে গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন ভৈরবীমা, 'প্রদীপটা নিভিয়ে দাও, আমি ধ্যানে বসব। আজ শুক্লা নবমী, দেখি জগন্মাতার কৃপা হয় কী না।'

বুধনদা চুপচাপ উঠে প্রদীপটা হাতের বাতাস দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে আমার পাশে এসে বসল। আর এতক্ষণ যে অন্ধকার অনেক চেষ্টা করেও গুহাতে ঢুকতে পারছিল না, সে যেন খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর।

আশেপাশে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, এমন ঘন অন্ধকার। বাইরে ঝিঁঝিঁপোকার আওয়াজটা যেন বহুগুণ বেড়ে উঠল। তারই মধ্যে জঙ্গলের ডালপাতা ঝরার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, ভেজা মাটি থেকে উঠে আসছে জংলী সোঁদা গন্ধ। অজানা বুনো ফুল ফুটেছে কোথাও, তার সুন্দর সুবাসে বাতাস যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। আমরা চুপচাপ বসে আছি, এমন

সময় শুনলাম ভৈরব মা বড় করে একটা শ্বাস নিলেন, আর অসম্ভব একটা গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'ওওওমম্‌।'

আর তারপরেই সামনের দৃশ্যটা দেখে আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো। বাপরে, যা দেখেছিলাম, সে-কথা ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।'

'কী দেখলে পিসি?' আমার গলা থেকে যে অমন চিঁ-চিঁ আওয়াজ বেরোতে পারে, সেটা আমি নিজেও জানতাম না।

পিসি আমাদের দিকে বড়ো-বড়ো চোখ করে তাকালেন, 'কী দেখলাম জানিস? দেখলাম যেখানে ভৈরবী মা বসে ছিলেন, সেখানে মায়ের পেটের দিকে, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে নাভির জায়গায়টায় যেন একটা ধীর আলোর পদ্ম ফুটে উঠল!

ব্যাপারটা বলতে যতটা স্বাভাবিক লাগছে, দেখলে অতটা স্বাভাবিক লাগার কথা নয়, বুঝতেই পারছিস। পুরুলিয়ার জঙ্গলের মধ্যে এক আদিম আরণ্যক গুহা, তার মধ্যে ধ্যানরতা তন্ত্রসিদ্ধা মায়ের শরীরের ভেতরে আলো জ্বলে উঠছে, এসব বাইরের লোক শুনলে গাঁজাখুরি গল্প ভাববে। অথচ তখনও কিছুই ঘটেনি, আমার অবাক হওয়ার তো সবে শুরু!

এরপর আলোটা আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগলো।

ব্যাপারটা এতই অস্বাভাবিক যে বলে বোঝাতে পারবো না। মানুষের শরীরের ভেতরে আলো, সেটা আবার নড়েচড়ে, এসব দেখে আমার স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি সব গুবলেট হয়ে গেছিল। অথচ কিছু অস্বীকার করার নেই, যা ঘটছে সেটা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে! তবে যেটা দেখে সত্যি আমার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হল, সেটা হচ্ছে আলোর পদ্মটা যে পথ ধরে ওপরে উঠছে সেই পথটা। স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে পথটা আমার খুব চেনা, কিন্তু নিজেকে কিছুতেই সেটা বিশ্বাস করাতে পারছি না।

ওটা পথ নয়, ওটা মানুষের শরীরের একটা অংশ।

ওটাকে বলে মেরুদণ্ড, শিরদাঁড়া!

ওই আলোর ফুল ভৈরবী মায়ের শিরদাঁড়া বেয়ে-বেয়ে ওপরে উঠছে। ঠিক সাপের মতো!

এবার আরেকটা দৃশ্য দেখতে পেলাম। দুটো বিদ্যুতের শিখা যেন সাপের শঙ্খলাগার মতো জড়ামড়ি করে সেই একই পথ বেয়ে একবার ওপরে উঠতে লাগল আরেকবার নীচে নামতে লাগল। কী তীব্র তাদের বিদ্যুচ্ছটা, কী দ্রুত তাদের চলন।

আর তারই মধ্যে সেই আলোর ফুলটি ধীরে-ধীরে ওপরে ভেসে উঠছে। যেন কোনও অমোঘ অদৃশ্য অলংঘনীয় শক্তি অতি কষ্টে টেনে তুলছে তাকে।

লক্ষ করলাম শুধু যে ওটা উঠতে লাগল তা নয়, ধীরে-ধীরে আরও ফুটতে লাগলো। যখন সেই আলোর পদ্ম মায়ের গলার কাছাকাছি, তখন এক অলৌকিক স্নিগ্ধ দ্যুতি মায়ের সারা শরীর জুড়ে খেলা করছে।

আমরা নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে বসে আছি। পেছন থেকে মংলাদা বা বুধনদা, কোনও একজনের দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার খটাখট শব্দ কানে আসছে। আমার চোখের পলক পড়ছে না, কোনওদিন সে এরকম দৃশ্য দেখতে পাব সে কথা আমার কল্পনার অতীত ছিল।

সেই আলোর পিণ্ড যখন কণ্ঠার কাছাকাছি, তখন সেই আলোয় মায়ের শরীর যেন ঝলমল করছে। তার সঙ্গে-সঙ্গে দেখলাম ভৈরবীমায়ের মাথার পেছনে ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে একটি স্বচ্ছ জ্যোতির্বলয়। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাচন্দনের আলোয় ভেসে যাচ্ছে ছোট্ট গুহাটি। সেই আলোয় দেখতে পাচ্ছি যে ভৈরবীমায়ের চোখ বন্ধ, বজ্রাসনে বসে আছেন তিনি। তাঁর সারা শরীর ঘিরে খেলা করছে এক আশ্চর্য মায়াময় আলোর স্রোত। তাঁর মুখে জেগে আছে গম্ভীর, প্রশান্তচিত্ত ভাব।

গলার কাছ অবধি সেই আলোকপদ্ম পৌঁছতেই গভীর ভাবে নিঃশ্বাস ছাড়লেন ভৈরবীমা। আর সেই অদ্ভুত আলোর খেলা দপ করে নিভে গেল, যেন শিশুর খেলাচ্ছলে বানানো দীপাবলির আলোকসজ্জা একফুঁয়ে নিভিয়ে দিল কেউ।

মংলাদা বা বুধনদা, কেউই প্রদীপ জ্বালানোর অবস্থায় ছিল না। বুধনদার কোঁচড় থেকে দেশলাই নিয়ে সে কাজটা আমাকেই করতে হলো।

প্রদীপ জ্বলে উঠলে দেখলাম মায়ের মুখটা গম্ভীর আর ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে আছে। মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন তিনি, তারপর মেরুদণ্ড টানটান করে সোজা হয়ে বসলেন, আর আমার দিকে চেয়ে বলতে শুরু করলেন।

'শোন রে মেয়ে। তোর বন্ধুর ওপরে কেউ তুক করেছে, আর করেছে খুব বড়ো কোনও গুণিন বা গুণিনেরা। এমনকি প্রাচীন ডাকিনীবিদ্যায় পারদর্শী কেউ হলেও অবাক হব না, এতই ভয়ঙ্কর সেই কালোজাদু। মারণ উচাটন বুঝিস?'

ও দুটো বিষয়ে জানা ছিল কিছু-কিছু। নিজের অজান্তেই ঘাড় নাড়লাম।

'তবে শুনে রাখ, যে বিষ এই মুহূর্তে তোর বন্ধুর শরীরে কালকেউটের মতো বাসা বেঁধে আছে তার থেকে জটিলতম, বীভৎসতম, অব্যর্থতম মৃত্যুবাণ আর নেই।' ভৈরবীমায়ের গম্ভীর গলায় যেন গমগম করতে লাগল গুহাটা। খানিকক্ষণ চুপ থেকে ফের বলতে লাগলেন তিনি।

'অনেক শোকতাপ পেয়ে তবেই এই তুক করার রাস্তা বেছেছে কেউ। মনের মধ্যে জ্বলতে থাকা দহনজ্বালা যখন সহ্যের অতীত হয়ে যায়, তখন তার থেকে মানুষের চিন্তায় কালগরলতুল্য বিষ উৎপন্ন হয়। সেই বিষাক্তহৃদয় মানুষটির তখন পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। নিজের সমস্ত পিছুটান জ্বালিয়ে দিলে তবেই এই অতি ভয়াবহ শাপসাধনায় ব্রতী হওয়া যায়। এত দুঃখকষ্ট, জ্বালা পেরিয়ে এই মহাসর্পতুল্য বিষের উৎপত্তি, তাই এর কোনও প্রতিষেধক নেই বললেই চলে।।"

"কী সেই বিষ, মা?" জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেল।

আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ভয়ের হিমেল স্রোত নামিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন ভৈরবীমা।

কালিয়া মাসান!

এই শব্দ দুটো বারবার উচ্চারণ করেছে লোকটা, মিলিয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে প্রত্যেকবার। তখন বুঝিনি, আজ ভৈরবীমায়ের কথা শুনে বুঝতে পারছি, কোন অভিশাপ বয়ে এনেছে এই শব্দ দুটো আমাদের জীবনে!

সেই রকমই ধীর চাপা গলায় বলতে লাগলেন তিনি,

'অকালে অপঘাতে মৃত কোনও শব দাহ করার পর তার যে ছাই পড়ে থাকে, সেটাই হচ্ছে কালিয়া মাসানের মূল উপাদান। সেই ছাই যদি বিশেষ তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শোধিত করা যায়, তবে তা হয়ে দাঁড়ায় অব্যর্থতম মৃত্যুবাণ। যাকে মারতে হবে, কোনও উপায়ে তাকে একবার খাইয়ে দিতে হবে সেই ছাই। ব্যস, তারপর যতক্ষণ না স্বয়ং মৃত্যু এসে সেই হতভাগ্যটির প্রাণহরণ করে তাকে অশেষ কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দিচ্ছে, ততক্ষণ সেই মন্ত্রপূত ছাই তার পেটে বসে থাকে, আর বিষসঞ্চার করে তার সারা শরীরে। তাকে ঘুমোতে দেয় না, উঠতে দেয় না, বসতে দেয় না। তার স্বপ্নে উঠে আসে নরকের বীভৎস, ভয়ঙ্করতম, নির্মম দৃশ্যাবলী। অপঘাতে মৃত যে মানুষটির শবদাহের ছাই খাওয়ানো হয়েছে, তার প্রেতাত্মা থেকে-থেকে ভর করে অভিশপ্ত মানুষটির শরীরে।'

'এর থেকে পরিত্রাণের কোনও উপায় নেই মা?'

'আছে। মৃত্যু।'

আমার মনে হলো যেন হৃৎপিণ্ডটা আমার গলার কাছে উঠে এসেছে। মুখ দিয়ে কথা সরছিল না আমার।

'আমার বন্ধুকে কলকাতা নিয়ে যেতে চাই মা। কাল সকাল অবধি...'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে হাত তুললেন তিনি, ক্লান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'না। পারবি না। আজকের রাতটা কাটবে না।'

নিজের বুকের ধক ধক শব্দটা নিজেই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

'এর থেকে মুক্তির কোনও উপায়?' আমার গলায় আর কোনও সাড় ছিলো না।

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন তিনি। তারপর কিছু ভেবে উঠে গেলেন গুহার একটু ভেতর দিকে, আর হাতে করে মালার মতো কী একটা নিয়ে এলেন। বিড়বিড় করে সেটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা নিয়ে যা, তোর বন্ধুর গলায় পরিয়ে দিস। দেখি মহামায়া এই বেটির কথা শোনেন কি না।'

মালাটা হাতে নিয়ে সভয়ে দেখি ছোটো ছোটো হাড়ের তৈরি মালাটা। কাঁপাকাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কীসের মালা মা?'

'এ হলো মহাশঙখের মালা। চণ্ডালের অস্থি দিয়ে তৈরী।'

ভয়ে হাতটা কেঁপে গেল আমার, তারপর মন শক্ত করে হাতে নিলাম ওটাকে, 'এতে সব ঠিক হয়ে যাবে তো মাঈজী? আমার বন্ধু ভালো হয়ে যাবে তো?'

'বলতে পারবো না রে বেটি। যেটা হাতে পেলে কিছু করতে পারতাম সেটা পাওয়ার কোনও কোনও উপায়ই নেই যে।' দুঃখিত স্বরে বলেন তিনি।

'কী সেটা, মাঈজী?' আগ্রহে এগিয়ে বসলাম।

চুপ করে থাকেন সেই ভূয়োদর্শী তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ মহিলা। তারপর আমার চোখে চোখ রেখে বলেন, 'সেটা হচ্ছে, যে লোকটা এই জাদুটোনা করেছে, এই ডাইনিবাণ ছুড়ে মেরেছে তোর বন্ধুকে, তার রক্ত। তার রক্ত ছাড়া এই মৃত্যুবাণের আর কোনও প্রতিষেধক নেই।' মায়ের গলাটা ক্লান্ত শোনায়।

মনের মধ্যে কোথাও দপ করে একটা অন্ধ, নৃশংস রাগ জেগে উঠলো আমার, বুঝলি। ওই লোকটা, ওই সাঁওতালটা, ও-ই দায়ী এর জন্যে। ও-ই বিষ খাইয়েছে মহুয়াকে, ঠেলে দিয়েছে নিশ্চিত মরণের মুখে। অথচ মহুয়া তো কোনও ক্ষতি করেনি ওর। তাহলে কেন? কীসের এত রাগ ওর?

প্রচণ্ড রাগে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো আমার। লোকটা নিশ্চয়ই আজ রাতে একবার না একবার সে আসবে, দেখতে আসবে তার শিকারের মৃত্যু, উপভোগ করবে মহুয়ার কষ্ট তারিয়ে-তারিয়ে। আজ যদি আসে সে, তবে আর ছাড়ব না তাকে...

'যা ভাবছিস তা নয় রে মেয়ে।' কোনও অলৌকিক ক্ষমতায় আমার মনের কথা জেনে ফেলেছেন তিনি, গলার স্বরে কোথায় যেন একটা তিক্ত কৌতুকের রেশ, 'তাকে ধরা শুধু যে কঠিন তা নয়, অবাস্তবও বটে। কোনও মরমানুষের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব। আর পেলেই বা কী? তার রক্ত তো আর পাওয়া যাবে না।'

এইবার বিস্মিত হওয়ার পালা আমার। মরমানুষের পক্ষে নাগাল পাওয়া শক্ত কেন? আর নাগাল পেলে তার রক্ত পাওয়া যাবে না কেন?

ভৈরবী মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার মনের কথা পড়ে ফেলতে বেশি সময় লাগল না ওঁর। আমার চোখে চোখ রেখে স্থির স্বরে বললেন, 'এখনও বুঝিসনি, কেন ওর শরীর থেকে রক্ত পাওয়া সম্ভব নয়? সত্যি বুঝিসনি?'

'না মাঈজী, আমি বুঝিনি। রক্ত কেন পাওয়া যাবে না লোকটার? মানে ধরাটা খুব কঠিন হতে পারে, কিন্তু একবার ধরতে পারলে রক্ত...'

'কারণ একটু যদি বিচার করে দেখতিস মেয়ে...' ফিসফিস করে বলেন তিনি, 'তাহলে অনেক আগেই বুঝতে পারতিস যে ওর শরীরে রক্তমাংস বলে আর কিছু নেই।' এই বলে থামেন তিনি। তারপর ওঁর গলার স্বর আরও ঘন

হয়ে আসে, আমার শিরশিরানি ভাবটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলেন তিনি, 'ওর শরীরটা শুধু ছাই দিয়ে তৈরি, ও ছাইয়ের মানুষ।'

*

ভৈরবীমাকে প্রণাম করে, সেই মহাশঙখের মালা নিয়ে বেশ রাতে যখন পৌঁছলাম বাংলোয়, তখন দেহে আর মনে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। একে সারাদিনের পরিশ্রম, তার ওপরে ভৈরবীমা নিজেও কোনও আশ্বাস দিতে পারলেন না, মনটাও একেবারে ভেঙে গেছিল। প্রায় সারাটা রাস্তা কাঁদতে-কাঁদতে ফিরেছি। বারবার চোখের জল মুছছিল বুধনদাও। তখনই শুনলাম যে বুধনদার একটি মেয়ে বড়ো বয়সে এমনই এক বর্ষার রাতে বজ্রপাতে মারা যায়, প্রথমবার মহুয়াকে দেখে তার কথাই মনে গেছিলো বুধনদার। তাই অত দুর্যোগের পর আমাদের খবর নিতে ছুটে এসেছে সে।

বাংলোয় পৌঁছে দেখলাম যে মহুয়ার অবস্থা আরও শোচনীয়, দেখেই মনে হচ্ছে যে ওর শরীরে আর প্রাণ বলে কিচ্ছু নেই। নির্জীব হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়া, মুখ দিয়ে অল্প-অল্প গ্যাঁজলা উঠছে। দরজায় ঠেস দিয়ে বসে আছে দীপাঞ্জন, উস্কোখুস্কো চুল, কান্নাকাটি করে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছে ছেলেটা। তার পাশে শক্ত মুখে বসে আছে জোশুয়া। বন্ধুর এই বিপর্যয়ে সে-ও যে খুব বিচলিত, সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

শুনলাম ফেরার সময় স্টেশন হয়েই ফিরেছে জোশুয়া। রেংতার মোটর সাইকেল নিয়ে দাদার নির্দেশমতো বিভিন্ন জায়গায় গেছিল সে। আমাদের ফেরত আসার ঘণ্টাখানেক আগেই ফিরেছে আর যে খবরটা সঙ্গে করে এনেছে সেটা যে খুব খারাপ তা বলা যাবে না।

খবরটা হচ্ছে যে লাইনের ওপর থেকে জল সরে গেছে বিকেল থেকেই, ট্রেন চলাচল একেবারে স্বাভাবিক। একবার যদি মেয়েটাকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারি....

কিন্তু মহুয়ার দিকে চেয়ে মনে হচ্ছে যে সুযোগ হয়তো আর পাওয়া হল না। শুনলাম এর মধ্যে আরও কয়েকবার রক্তবমি করেছে মেয়েটা। ছোটখাটো শরীরটা কয়েকঘণ্টার মধ্যেই যেন বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। কালো, লম্বা লম্বা শুকনো আঙুলগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন ডাইনির আঙুল। মুখের মধ্যে একটা নীলচে ভাব, ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে মেয়েটা। অসহ্য ব্যাথায় পেটটা আঁকড়ে ধরে আছে সে, মুখেচোখে একটা বিকৃত ভঙ্গি। ঘরের জানালা খুলে দেওয়া হয়েছে, তা-ও সারা ঘর জুড়ে সেই রক্তবমির উৎকট কটু গন্ধ।

এরই মধ্যে অবাক হলাম পিটারের আচার আচরণ দেখে। কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা একজন ডাক্তার যে এরকম সঙ্কটময় সময়ে রোগীর চিকিৎসা না করে শিলনোড়াতে বিভিন্ন অজানা লতাপাতা আর ছোটো ছোটো ফল পিষে, তাদের রস বের করে বিভিন্ন ছোটো ছোটো কাঁচের বাটিতে রাখতে পারে, সেটা দেখাটাও একটা অভিজ্ঞতা বটে।

আমি এসে দরজায় দাঁড়াতে আমার দিকে চোখ তুলে চাইল পিটার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো কী, পিটারদা?'

'সে-সব পরে বলছি। আগে বলো ভৈরবীমাঈ কী বললেন?'

এটা বলার পরই ওর চোখ গেলো আমার হাতে ঝুলে থাকা সেই মহাশঙ্খমালাটির দিকে। সরু চোখে একবার তাকালো তার দিকে, আর মুহূর্তখানেক পরেই বিস্ফারিত হয়ে উঠলো ওর চোখ দুটো। হাতের কাজ ছেড়ে দ্রুতপদে উঠে এল সে, বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এ-জিনিস কোথায় পেলে দীপান্বিতা?'

ওকে বলতেই হল পুরো ঘটনাটা। পুরোটা মন দিয়ে শুনলো পিটার। খেয়াল করলাম যে ভৈরবীমায়ের শিরদাঁড়া বেয়ে আলোর ফুল ওঠার কাহিনিটা বর্ণনা করার সময় তন্ময় হয়ে একাগ্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে ও, দু'চোখে অপার বিস্ময় আর শ্রদ্ধার ভাব।

এটা নিয়ে কী করতে হবে সে কথা ভৈরবীমা কিছু বলে দেননি। আমি কী করব ঠিক করতে না পেরে শেষে মালাটা গিয়ে অতিকষ্টে মহুয়ার গলায় পরিয়ে দিলাম।

আর খেয়াল করলাম যে ওর গা'টা ঠান্ডা। ভীষণ ঠান্ডা। প্রায় মরা মানুষের মতো।

পিটার ততক্ষণে ওর কাজ শেষ করে এনেছিল প্রায়, একটা বড়ো বাটিতে বিভিন্ন অনুপাতে মেশাচ্ছিল ওষুধগুলো। অসম্ভব গম্ভীর হয়ে আছে মুখটা। আমাকে শুধু একবার জিজ্ঞেস করল, 'কালিয়া মাসান? তাই বললেন ভৈরবীমা? ঠিক শুনেছো তুমি?'

জলভরা চোখে মাথা নাড়লাম একবার।

মাথা নামিয়ে ফের নিজের কাজ করতে-করতে বিড়বিড় করে সে, "কালিয়া মাসান তা হলে। আমিও তাই-ই ভেবেছিলাম, তাই সেইমতই এগুলো আনতে দিই। শোনো এটাকে বলে মাসানকাটার রস। জটামাংসী, হাতিশুঁড়, মারহাটিটিগা গাছের ফুল, গুড়মারবুটির লতা, হিমচাঁপার পাপড়ি, কাকমাচির ফল, ডুলিচাঁপা ফুলের কেশর আর এইটা...' বলে একটা ছোটো লতার কাটা অংশ তুলে ধরে সে, 'বিষকাটালীর ফুলশুদ্ধু লতা। কপাল ভালো যে একচান্সে পেয়ে গেছি। তবে যেটা ভাবছিলাম একেবারেই পাবো না, সেটা ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেছি। সেটা হচ্ছে এইটা। বলে মার্বেল গুলির মতো কালো-কালো কয়েকটা কী যেন তুলে দেখালো, 'কালধুতরোর বীজ। একমাত্র এই জঙ্গলেই পাওয়া যায়, গোখরো সাপের বিষের থেকে কম কিছু নয়। এ-জিনিস খুঁজে পাওয়া অনেক ভাগ্যের কথা।' বলে ফের

কাজে মন দেয় পিটার।

'ইয়ে, পিটারদা, তুমি কি জেনেশুনে এই কালধুতরোর বিষ মেশাচ্ছ ওষুধে?' সন্দেহ যায় না আমার। ধুতরো গাছের বীজ যে তীব্র বিষ সেটা জানা ছিল আমার।

মৃদু হাসে সেই শক্তপোক্ত শরীরের সাঁওতাল ছেলে, 'যা বিষ তাই অমৃত, যা অমৃত তাই বিষ, বাবা বলতেন। সবই নির্ভর করে তুমি যদি জানো কখন কতটা কী ভাবে ব্যবহার করা উচিৎ তার ওপরে, তাই না?'

'আর, আর...' কথাটা মুখে এসেও আটকে যায়, 'ভৈরবী মা যে বললেন যে... যে... যে লোকটা এই বিষ খাইয়েছে তার রক্ত লাগবে এই বিষের প্রতিষেধক হিসেবে?'

'রক্ত?' ভুরু কুঁচকে যায় পিটারের, 'যদিও এ-ওষুধ বড়ো ডেঞ্জারাস ওষুধ, বাবা বারবার বলতেন, সামান্যতম ভুলচুকে মহাসর্বনাশ হয়। তবে রক্তের কথা তো তিনি বলেননি কিছু! এই মাসানকাটার একটি ফোঁটাও মাটিতে অবধি ফেলতে নেই, রোগীকে পুরোটাই খাইয়ে দিতে হয়, এত তীব্র এই বিষ-ওষুধ। তিনি এ-সব শিখেছিলেন আমার ঠাকুর্দার কাছ থেকে। তিনি আবার তাঁর বাবার কাছ থেকে। এঁরা সবাই জীবনে এক আধবারের বেশি বানাননি মাসানকাটার ওষুধ। হ্যাঁ, এটা শুনেছি যে এঁরা কখনও নিজের হাতে এই ওষুধ কোনও রুগীকে খাওয়াননি, অন্য কারও হাতে, বিশেষ কারও হাতে খাইয়েছেন। কিন্তু, কই কোথাও তো কারও রক্তের কথা বলা নেই।'

ফের সবকিছু গুলিয়ে যায় আমার। তাহলে ভৈরবীমা কি ভুল বললেন? উনি যে স্পষ্ট করে বললেন, যে প্রয়োগ করেছে এই অব্যর্থতম মৃত্যুবাণ, তারই রক্ত এই বিষের একমাত্র প্রতিষেধক?

ইতিমধ্যে সবকিছু তৈরী করে ফেলেছিল পিটারদা। এরপর ও আমাকে ছাড়া সবাইকে বললো ঘর থেকে চলে যেতে। ঘর খালি হলে আমার দিকে ঘুরল, তারপর গম্ভীর স্বরে বললো, 'এবার এই ওষুধটা ওকে খাওয়াতে হবে দীপান্বিতা। ওটা তোমাকেই খাওয়াতে হবে, কারণ আমি তখন মন্ত্র পড়বো। আমার বাবাকেও দেখেছি অন্য কাউকে দিয়ে খাওয়াতে। তবে সেটার জন্যে সবাইকে চলে যেতে বলিনি।'

'তাহলে?'

'ওষুধ খাওয়ানোর পর দুই থেকে তিনঘণ্টা মেয়েটা অসম্ভব কষ্ট পাবে। সে কষ্ট চোখে দেখা যায় না। ওই জন্যে বাকিদের সরিয়ে দিলাম। ওই সময়টুকুর জন্যে ওকে সামলে রাখাটা খুব জরুরি। যদি সেই সময়টা পেরিয়ে যায় তো এ-যাত্রা বেঁচে গেল। নইলে....' এই বলে চুপ করে গেল সে।

কিছুই করার নেই। আমি জানি যে এতসব করেও কিছুই হবে না। ভৈরবীমা বলেই দিয়েছেন যে আজ রাতটা কাটবে না, কিছুতেই না। কিছুতেই কিছু হবার নয়। সেই ভৌতিক মানুষটা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে তার নিজের শরীরের সমস্ত রক্ত। যে রক্ত পেলে হয়তো বাঁচালেও বাঁচাতে পারতাম মেয়েটাকে। তবু কিছু তো করি! মরলে মেয়েটা আমার কোলেই মরুক, একটা সান্ত্বনা অন্তত থাকবে....।

ওষুধটা খাওয়াতে তেমন বেগ পেতে হল না। একটা চামচ ওর দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ওষুধটা ঢেলে দিতে লাগলাম। আর তখনই খেয়াল করলাম যে ওর দাঁতগুলো কালো হয়ে আছে। মুখের নীলভাবটা আরও কালচে হয়ে উঠেছে। চোখদুটো বোজাই আছে, তাদের দুইপ্রান্তে শুকিয়ে যাওয়া চোখের জলের দাগ।

অর্ধেকটা খাইয়ে বাকি অর্ধেকটা পিটারের নির্দেশ মতো রেখে দিলাম।

এইসময় কানে এল সাঁওতালি ভাষায় উচ্চারিত কিছু মন্ত্র, সুরেলা গলায় কিছু একটা গাইছে পিটার।

ওষুধটা খাইয়ে পিটারের দিকে ফিরে বসলাম। দেখি একটা গ্লাস থেকে জল নিয়ে হাতে করে চারিদিকে ছিটোতে ছিটোতে সারা ঘরটা প্রদক্ষিণ করছে পিটার, আর সুর করে গাইছে,

সের চাওলে কুপি সুনুম,
লেটের আদিঞ অগমকালি মাঙ্গী।
নিয়া জাতরা অন্ত রেণা, কাথা কাল মাঙ্গী,
লালই দেন্না তিং।

এর পরে দেখি পিটার ঘরের কোনা থেকে তিনটে মাটির পিণ্ড এনে মেঝের মাঝখানে এমন ভাবে রাখল, যেন মনে হচ্ছে একটা ত্রিভুজের তিনটে শীর্ষবিন্দু। সেই পিণ্ডগুলোতে তিনটে শালগাছে ডাল পুঁতল তারপর, আর একটা লাল সুতো দিয়ে ডালগুলোর মাথা বাঁধল। এরপর দরজা খুলে বাইরে গেল একটু, ফিরে এল মিনিটখানেক বাদে। আর এসেই যে জিনিসটা ওই ত্রিভুজের মধ্যিখানে রাখল সেটা দেখে শিউরে উঠলাম আমি।

একটা কালো রঙের মুরগীর কাটা মাথা। তার গায়ে রক্ত লেগে আছে এখনও।

পিটার অবশ্য আমার শিউরে ওঠাটাকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে একের-পর-এক বিভিন্নসব বিচিত্র দর্শন পাথরের টুকরো, নাম না জানা পশুর লোম, শুকিয়ে যাওয়া সাপের মাথা, কাকের পা আর ধানদুব্বোর সঙ্গে লাল টকটকে কয়েকটা জবাফুল, এরকম কিছু জিনিস সেই কাটা মাথাটাকে ঘিরে রাখতে লাগল। এ-সব শেষ হওয়ার পর অতি যত্নে একটা আধ আঙুল লম্বা, সাদা রঙের ছুঁচলো কী একটা যেন বার করে সেই কাটা মাথাটার ওপর রাখতে আমি সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ওটা?'

'কালকেউটের বিষদাঁত।' শান্তস্বরে জবাব দিলো পিটার। শুনে আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না।

এরপর সেই পিণ্ড তিনটির সামনে দক্ষিণমুখী হয়ে বসে, বিচিত্র সুরে সাঁওতালি মন্ত্র আওড়াতে লাগলো পিটার। মাঝেমাঝে হাতের মুদ্রায় বিচিত্র সব ভঙ্গি করতে লাগল। আমি আড়চোখে মহুয়ার দিকে তাকালাম। কোনও চেঞ্জ

দেখলাম না।

এমন সময় দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ গেল। রাত দুটো।

ফিসফিস করে বলে উঠল পিটারদা, 'এইবার শুরু হবে।'

আর বলার সঙ্গে-সঙ্গে বোবা গলায় একটা আর্তনাদ করে উঠল মহুয়া। তাকিয়ে দেখি চোখ দুটো খুলে গেছে ওর, চোখের সাদা অংশটা গাঢ় হলদে হয়ে আছে, মণিদুটো হয়ে এসেছে অনেক ছোটো।

আমি দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। আর ধরতেই যেন একটা ইলেকট্রিক শক খেলাম। বাপ রে বাপ, তখন দেখি ওর গায়ে কোথা থেকে যেন দৈত্যের শক্তি ভর করেছে। ওই রুগ্ন অসুস্থ শরীরে এত আসুরিক গায়ের জোর কোথা থেকে যে এলো তা কে জানে! সারা বিছানা যেন উথালপাতাল হয়ে যেতে লাগল সেই অজানা আক্রোশে। বড়ো বড়ো চোখে, সম্পূর্ণ উন্মাদের মতো গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে সে কী তাণ্ডব, বাধা পেয়ে শেষে আমাকে এলোপাথাড়ি চড় থাপ্পড় মারতে শুরু করল মেয়েটা।

পিটার হেমব্রম, বেদিয়াদের শেষ প্রতিনিধি কিন্তু তখন অবিচল! ক্রমেই তার মন্ত্র আরও উচ্চকিত হয়ে উঠতে লাগলো।

এই ধস্তাধস্তি চলল আরও বেশ খানিকক্ষণ। বুঝতে পারছি যে আওয়াজ শুনে দীপাঞ্জন, রেংতা, মংলাদা, এরা সব বাইরে এসে জড়ো হয়েছে। তবে বুঝলাম যে এই ঘটনার ব্যাপারে ওদের বোধহয় আগেই বলা ছিল, একজনও কিন্তু ভেতরে ঢুকে এল না! কিছুক্ষণ পরে পায়ের শব্দ পেয়ে বুঝলাম ওরা চলে যাচ্ছে বাংলোর অন্যদিকে। একটা চাপা কান্নার শব্দও পেলাম। কেউ না বলে দিলেও বুঝতে অসুবিধা হলো না যে ওটা দীপাঞ্জনের কান্নার আওয়াজ।

এদিকে সে-যে কী ভীষণ লড়াই চলতে লাগল আমাদের মধ্যে সে বলে আর তোদের বোর করব না। তোদের হ্যারি পটার অ্যান্ড প্রিজনার অফ অ্যাজকাবানের সেই অ্যানিম্যাঙ্গাস ফর্মে সিরিয়াস ব্ল্যাক ভার্সেস রেমাস লুপিনের লড়াইটা মনে আছে? একদম সেই অবস্থা! তফাৎ একটাই, সেই লড়াইটা হয়েছিল সমানে সমানে। এখানে এক্কেবারে একপেশে লড়াই, একতরফা ভাবে মার খেয়ে গেলাম। আঁচড়ে-কামড়ে, লাথি চড় কিল ঘুষি মেরে আমাকে যেন খুনই করে ফেলবে মেয়েটা।

এত কিছুর মধ্যে শুধু এইটা একবার খেয়াল করলাম যে ওর শ্বদন্ত দুটো হঠাৎ করেই একটু বড়ো দেখাচ্ছে যেন!

পিটার সেই সাঁওতালি ভাষায়, অদ্ভুত সুরেলা গলায় মন্ত্র আউড়েই যাচ্ছে। থেকে থেকে উঁচু হচ্ছে তার গলার স্বর। নিজের আসন থেকে একটুও নড়েনি সে, বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়নি একবারও।

এরই মধ্যে একবার নেতিয়ে পড়লো মহুয়া। অনেক কষ্টে সেই শীর্ণ শরীরটাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গভীর শ্বাস ছাড়লাম আমি। তারপর দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ গেলো।

রাত তিনটে।

আর ঘন্টা দেড়েকের ব্যাপার। যদি কোনওক্রমে কাটিয়ে দিতে পারি...

এবার চোখ গেল পিটারের দিকে। অর্ধেক খাওয়ানো ওষুধের গ্লাসটা টেনে নিল সে। আর মন্ত্র বলতে-বলতে মুর্গীরা কাটা মাথাটা তুলে চিপে-চিপে ঠিক একফোঁটা রক্ত ফেলল সেই মিশ্রণে। এবার ঘরের কোনায় একটা হামানদিস্তা টেনে নিল সে, আর সেই কালকেউটের বিষদাঁতটা তার মধ্যে ফেলে দিয়ে আরও কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করতে-করতে গুঁড়ো করতে লাগল সেই দাঁতটাকে। মিনিটখানেক পর সেই গুঁড়োগুলো গ্লাসের মধ্যে ফেলে গ্লাসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ইশারায় বলল, খাইয়ে দাও।

কাঁপা-কাঁপা হাতে গ্লাসটা হাতে নিলাম, আর আগের মতোই দাঁতের পাটির মধ্যে চামচ ঢুকিয়ে কালকেউটের বিষদাঁত শুদ্ধু সেই ওষুধটা ঢেলে দিলাম মহুয়ার গলায়। ওঁক করে একটা আওয়াজ তুলে সেটা খেয়েও নিল মেয়েটা।

কেটে গেল আরও মিনিট কুড়ি।

রাত সাড়ে তিনটে। আর আধ ঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

আমি তাকিয়ে ছিলাম পিটারের দিকে। দেখি শিরদাঁড়া টানটান করে উঠে বসেছে ছেলেটা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে মহুয়ার বিধ্বস্ত শরীরের দিকে। আমার দিকে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকালো সে আর দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কী যেন একটা মনে-মনে ক্যালকুলেট করে নিল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'এইবার, শেষ কামড়।'

অথচ আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু খেয়াল করলাম যে মৌয়ের মুখ থেকে নীলচে সবুজ গ্যাঁজলা উঠতে শুরু করেছে, ওই শীতের রাতেও কপাল থেকে দরদরিয়ে নামছে ঘামের স্রোত। মুখটা অদ্ভুত ভাবে লম্বাটে হয়ে গেছে, ক্রমশ কালো হয়ে উঠছে চামড়ার রঙ। তার ওপর শেষসময় উপস্থিত হলে মানুষ যেমন লম্বা-লম্বা শ্বাস নেয়, সেইরকম শ্বাস নিচ্ছে মেয়েটা।

আমার বুকের ভেতরটা না কেমন যেন বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে এল, বুঝলি? বুঝতে পারলাম শেষ অবস্থা শুরু হয়েছে মেয়েটার, আর হয়তো কয়েকটা মিনিট। হাত নাড়াতে গিয়ে বুঝলাম যে আমার হাতেপায়ে আর সাড় নেই...

এমন সময় হঠাৎ চোখ খুলে চাইল মহুয়া। সিলিং এর দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর অল্প ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে হাসিমুখে তাকালো। আমি তো অবাক! একটু আগে দু'জনের মধ্যে যে কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে তার চিহ্নমাত্র নেই। এক্কেবারে স্বাভাবিক চোখমুখ, মুখে মৃদু হাসির ছোঁয়া, মানে, যেমন ওকে সচরাচর দেখা যায় আর কি। যেন আমাদের চিরচেনা সেই মহুয়া, এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলো। একটু পর আড়মোড়া ভেঙে উঠে, মুখহাত

ধুয়ে, সেজেগুজে আমার সঙ্গে অষ্টমীতে পুজোর অঞ্জলি দিতে যাবে।

শুয়ে-শুয়েই মহুয়া আমার দিকে তাকিয়ে ভারি মিষ্টিভাবে হাসল একবার। আর তারপরই স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো চকিতে কোমর ভাঁজ করে, শরীরের উর্ধ্বাংশটা তুলে এনে আমার বাঁ-কাঁধটা সজোরে কামড়ে ধরল ও, বাঁ-হাত দিয়ে চেপে ধরল আমার টুঁটি!

ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে বুঝতে বুঝতেই আমার সময় লাগল খানিকটা। তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে ওকে যখন ঝটকা দিয়ে ফেলে দিয়েছি, তখনই মনে হচ্ছে আমার কাঁধের খানিকটা কে যেন খুবলে নিয়েছে। জ্বলন্ত শিক ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো যন্ত্রণায় আমার বাঁ-দিকটা পুরো অসাড় হয়ে এল।

তারপর একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত ভৌতিক ক্যারক্যারে পুরুষালি গলায় হি-হি-হি করে হেসে উঠলো মেয়েটা। তারপর তার সঙ্গে দুলে-দুলে হাততালি দিতে লাগল।

গলাটা শুনে আমার ঘাড়ের সমস্ত রোম দাঁড়িয়ে গেল, বুঝলি! রাতবিরেতে চেনাজানা কোনও মেয়ের মুখে ছেলের গলায় ভুতুড়ে স্বরে খিলখিল হাসি শুনলে ভয় লাগারই কথা। কিন্তু আমার ভয় লাগার আরও একটা অন্য কারণ ছিল।

ব্ল্যাকবোর্ডের ওপরে নখের আঁচড় কাটার শব্দের মতো এই গলাটা আমার চেনা।

এ-গলার স্বর আমি আগেও শুনেছি।

কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায়। মাস দেড়েক আগে।

এটা সেই লোকটার গলা। সেই ছাইয়ের মানুষ!

পিটারের দিকে তাকিয়ে দেখি চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কী যেন উচ্চারণ করে চলেছে সে। এই শীতের রাত্রেও ঘামে ভিজে গেছে তার জামা। এদিকে মহুয়া সেই ভুতুড়ে গলায় খলখল স্বরে হাসতে-হাসতে ঘরের বাতাসকে শিউরে তুলেছে। হাসতে-হাসতেই হঠাৎ করে একবার হেঁচকি তুললো মহুয়া, আর তারপরেই চেপে ধরল নিজের গলাটা।

আমিও আঁতকে উঠলাম।

দেখলাম দীর্ঘ কালো নখগুলো দিয়ে ও আঁকড়ে ধরেছে নিজের গলা, চোখদুটো বড়ো-বড়ো হয়ে উঠেছে। ঠিক যেন একটা ফাঁসীর আসামীকে গলায় ম্যানিলা রোপ পরিয়ে সজোরে টেনে ধরেছে কেউ!

পরের দৃশ্যগুলো স্রেফ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দেখতে হল আমার। বরফের মতো ঠান্ডা হাত-পা নিয়ে দেখলাম যে মেয়েটা আঁচড়ে ফালাফালা করে দিচ্ছে নিজের গলা। যে অদৃশ্য পাশ সাক্ষাৎ কালসাপের মতো চেপে বসেছে ওর গলায়, সর্বস্বপণ করে ও চেষ্টা করছে তার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে।

আমি সভয়ে সরে এলাম, আমার ক্ষমতা নেই এই অতিলৌকিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার।

এদিকে মহুয়ার অবস্থা ক্রমেই কাহিল হয়ে উঠছে। কাটা পাঁঠার মতো বিছানার ওপর পা-দুটো দাপাচ্ছে ও। মুখচোখ ফুলে নীল হয়ে এসেছে, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে। রক্তাক্ত গলাটা দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনও হিংস্র প্রাণী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওর ওপর। ডাইনির হাতের মতো কালো হাতদুটোর শিরা ফুলে উঠেছে। শ্বাসবন্ধ হওয়ার শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে আরও। আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে, আমি বুঝতে পারছি না কী করব...

এমন সময় দেখলাম দপ করে নীল আগুনের মতো জ্বলে উঠল মহুয়ার গলায় ঝোলানো সেই মহাশঙখের মালাটা। সাদা হাড়ের মধ্যে যেন বিদ্যুতের মতো খেলা করে যেতে লাগল ছোটো-ছোটো নীল আলোর শিখা।

এক ভৌতিক আতঙ্কের সঙ্গে যুঝতে লাগল আরেক অপার্থিব অভয়শক্তি।

জানি না কতক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিলাম এই

অনৈসর্গিক দৃশ্যের সামনে। একসময়ে ভেবেছিলাম বুঝি হেরেই গেলাম এই লড়াইতে। কিন্তু কিছু পরে বুঝতে পারলাম যে ধীরে হলেও আস্তে-আস্তে এই যুদ্ধের ফলাফল আমাদের পক্ষে চলে আসছে। যদিও তখনও লড়ে যাচ্ছে মহুয়া, তবে বুঝতে পারছিলাম যে আস্তে-আস্তে সেই অজানা ফাঁস আলগা হতে শুরু করেছে। আওয়াজ করে শ্বাস নিতে শুরু করেছে মেয়েটা। আস্তে-আস্তে ছটফটানিটা কমে এল, বন্ধ হল গলা আঁচড়ানো।

তারপর একসময়ে দম শেষ হওয়া কলের পুতুলের মতো ঠাস করে বিছানার ওপর নিঃসাড়ে পড়ে গেল মেয়েটা।

ওর দিকে ছুটে যাবার আগে আমার চোখ গেল জানালায়।

দেখলাম, বাইরের জমাট অন্ধকারে জানালার গ্রিল জুড়ে আস্তে-আস্তে ফুটে উঠছে একটা মুখ। বীভৎস ক্রুর সেই মুখাবয়বে ফুটে উঠছে এক ভয়াল আদিম জিঘাংসা। এই ভয়ঙ্কর মুখটাকে আমি চিনি, খুব চিনি। আর আজকে এ-ও জেনেছি যে এই মুখ রক্তমাংসের কোনও মানুষের মুখ নয়। এর শরীরে বাসা বেঁধে আছে প্রাচীন বিষ, এর ধমনীতে খেলা করে বেড়ায় যন্ত্রণার আগুন, এর চৈতন্য জুড়ে শুধু প্রতিশোধের উদগ্র বাসনা। এই মরপৃথিবীর বাসিন্দা নয় ও, নরকের কোনও অতল থেকে উঠে এসেছে, ছাইয়ের মানুষ!

জানালার ওইদিকের অন্ধকারে যার অভিশপ্ত মুখখানি ফুটে উঠেছে, জানালার এ-পারে মহুয়ার গলায় তারই স্বর ঘরের বাতাসে খেলে বেড়াচ্ছিলো ভৌতিক ছাইয়ের মতো!

খেয়াল করলাম যে সেই মুখে একটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধার দৃষ্টি। তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষিত কিছু বহু প্রতীক্ষার পর হঠাৎ করে পেয়ে গেলে হিংস্র ভিখিরির মুখে যে দৃষ্টি দেখা যায়, এ সেই দৃষ্টি। বুঝতে অসুবিধা হয় না, শিকারকে বাগে পেয়ে তাকে একটু-একটু করে কাটার মধ্যে যে পৈশাচিক আনন্দ আছে, লোকটার মুখেচোখে খেলা করে বেড়াচ্ছে সেই নারকীয় উল্লাস।

আমিও কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম লোকটার মুখের দিকে।

কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, এমন সময় একটা জিনিস খেয়াল করে একটু আশ্চর্য লাগলো। মানে তখন মনের যা অবস্থা তাতে ভয় ছাড়া অন্য অনুভূতি ফিল করার কথা নয়, তবুও অবাক হওয়াটাকে এড়াতে পারলাম না।

এর আগে যতবারই মুখোমুখি হয়েছি লোকটার, বরাবর দেখেছি যে ওর দৃষ্টি মহুয়ার দিকে। ঈশ্বর জানেন মহুয়ার ওপর কেনই বা ওর অত রাগ, কিন্তু প্রথম থেকেই মহুয়াই ছিল ওর ধ্যানজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু।

এইবার দেখলাম, প্রথমবারের জন্যে দেখলাম, যে লোকটা মহুয়ার দিকে তাকিয়ে নেই। তার দৃষ্টি অন্য আরেকজনের দিকে।

পিটার।

ততক্ষণে ভয়ে আতঙ্কে পাগল হয়ে যাওয়া মাথায় ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না স্বাভাবিক কারণেই। শুধু এইটা বুঝলাম, যে দৃষ্টিটাকে আমি ক্রুর সর্বগ্রাসী লোভাতুর দৃষ্টি ভেবেছিলাম, সেটা আসলে অন্য দৃষ্টি। ওই দৃষ্টিতে ক্ষুধা থাকতে পারে, কিন্তু নিষ্ঠুরতা নেই। বরং অন্য একটা জ্বলজ্বলে আবেগ ফুটে উঠেছে সেই চোখে। সেটা প্রথমে ধরতে পারিনি, খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আমি বুঝতে পারলাম যে ওটা কীসের আবেগ।

ওটা বুভুক্ষু স্নেহাতুর হৃদয়ের দৃষ্টি। ও জিনিস মৃতপ্রায় শিকারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শিকারীর চোখে মানায় না।

আমার সামান্য বাঁ-দিকে পিটার বসে আছে চোখ বন্ধ করে। আর আমার ডাইনে জানালার বাইরে সেই লোকটার মুখ। সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে দুজনকেই আমার নজরবন্দী করতে পারছি। দু'দিকেই বেশ কিছুক্ষণ, মিনিটখানেকও হতে পারে, ঠিক বলতে পারব না, তাকিয়ে থাকার পর একটা অবিশ্বাস্য জিনিস আমার নজরে এল। বারবার দেখছি ব্যাপারটা, বিশ্বাস করতে আমার মন চাইছে না। অথচ সেটা এতই জলজ্যান্ত হয়ে ফুটে উঠেছে যে নোবডি ক্যান মিস দ্যাট!'

'অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দ্যাট?' আমার ভূতপ্রেতে ঘোর অবিশ্বাসী বাবা জিজ্ঞেস করলেন ফিসফিস করে। আমরা বাকিরা তখন পটের ছবিটির মতো স্পেলবাউন্ড হয়ে বসে আছি। আমাদের সবার মুখের ওপর একঝলক তাকিয়ে নিলেন দীপুপিসি। তারপর গলাটা খাটো করে বললেন,

'দেখলাম যে পিটার আর লোকটাকে হুবহু একইরকম দেখতে। হুবহু মানে হুবহু, এক্কেবারে কার্বন কপি বললেই চলে। শুধু লোকটার মুখে নোংরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আর পিটার এক্কেবারে ক্লিন শেভন। এছাড়া দু'জনের মুখের মধ্যে এতটাই মিল, যেটা অনাত্মীয় দু'জন মানুষের মধ্যে হওয়া কার্যত অসম্ভব! চট করে দেখলে মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে এদের মধ্যে কোনও-না-কোনও সম্বন্ধ আছেই, মানে কোনও-না-কোনও রক্তের সম্বন্ধ...রক্তের সম্বন্ধ... রক্তের...রক্ত.....

একটা কথা আমার নিঃসাড় মগজে যেন বিদ্যুতের চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল।

ভৈরবীমা বলেছিলেন না, এই বিষের প্রতিষেধক শুধু সেই ছাইয়ের মানুষের রক্ত? সে কী রক্তের ফোঁটা দিয়ে তৈরী ওষুধ? নাকি অন্য কিছু? রক্ত মানে কি শুধু রক্তের ফোঁটা?

রক্ত বলতে বংশধারাও বোঝায় না?

কথাটা ভাবতে যে কয়েকমুহূর্ত লাগল, তার মধ্যেই আমার মগজে গেঁথে গেলো কথাটা, আমার সামনে যে ছেলেটা বসে আছে সে শুধু পিটার নয়, আসলে সে এই ছাইয়ের মানুষের উত্তরপুরুষ! তারই রক্ত বইছে সাঁওতালদের শেষ

বেদিয়া এই পিটার হেমব্রমের দেহে।

কোনও ওষুধ নয়, পিটারই আসলে এই মহৌষধের অন্যতম উপাদান। একমাত্র তার হাতে বানানো মাসানকাটাই নিরস্ত করতে পারে এই মহাশাপের বিষ। অর্থাৎ ভৈরবীমায়ের কথাই সত্যি হলো, যার অভিশাপে আজ মহুয়ার এই অবস্থা, তারই রক্ত এসে দাঁড়িয়েছে প্রতিষেধক হিসেবে। অব্যর্থতম মৃত্যুবাণের সামনে অভেদ্যতম বর্ম!

আবার তাকালাম জানালার দিকে। কেউ নেই। কিচ্ছু নেই।

দিগন্তে তখন ভোরের ক্ষীণ লালচে আভা। দিন শুরু হতে চলেছে প্রায়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিছানা থেকে একটা ক্লান্ত মৃদু আওয়াজ কানে আসায় ঘুরে বসলাম আমি। দেখি চোখ খুলে উঠে বসার চেষ্টা করছে মহুয়া, আমাকে দেখে প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় বলল, 'শরীরটা খুব খারাপ লাগছে রে। কিছু খেতে দিবি?'

এবারের মতো শেষবারের জন্যে ওকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম আমি।'

গল্প শেষ করে চুপ করে বসে ছিলেন দীপুপিসি। আমরাও নির্বাক। শুধু অরিজিৎ একবার জিজ্ঞাসা করলো, 'ওই মহাশঙখের মালা তোমার কাছে আছে এখনও?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন দীপুপিসি।

'পরের দিন আমরা ভৈরবীমায়ের থানে গিয়ে দেখি যে গুহা বেবাক ফাঁকা, বাঘছালটা ছাড়া সবই ফেলে গেছেন। সন্ন্যাসী মানুষ, হয়তো অন্য কোথাও গিয়ে ডেরাডাণ্ডা বেঁধেছেন। দেখে বুধনদা, মংলাদা, রেংতা, সবাই খুব আফশোস করছিল। আমি ওদের চোখ এড়িয়ে সেই গুহার মধ্যেই মালাটা রেখে আসি, ও জিনিস কাছে রাখার সাহস ছিল না আমার।

সেইদিনই বিকেলের ট্রেনে কলকাতা নিয়ে আসি মহুয়াকে। পাক্কা আড়াইমাস ভুগেছিলো মেয়েটা। সেরে ওঠার পর সেই হাসিখুশি মহুয়াকে আবার ফিরে পেয়েছিলাম বটে, তবে একটা অভ্যাস চিরতরে ছেড়ে গেছিলো ওর। যেখানে সেখানে ফুচকা আর ঘুগনি খাওয়ার অভ্যেসটা।'

*

জঙ্গলের ধারে একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। ভোরের বাতাসে সামান্য কাঁপছিলো তার দেহ। সামনে ক্ষীণতোয়া কাঁসাই নদীর বুকে লেগেছে পূব দিগন্তে সদ্য জেগে ওঠা অল্প লাল আভার রঙ। সেইদিকে নিষ্পলকে সে তাকিয়ে ছিল।

ব্যর্থ হয়েছে সে। তার দেওয়া অব্যর্থ অভিশাপ-বিষ আজ ব্যর্থ হয়ে গেছে, সত্যি হয়েছে ডানবুড়িদের কথাই। তারই রক্ত এসে আজ নিষ্ফল করে দিয়েছে তার এতদিনের জমিয়ে রাখা ক্রোধ, ধুলোয় মিশে গেছে তার উগরে দেওয়া ঘৃণা। যার জন্যে দেড়শো বছর ধরে এই ছাইয়ের দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে সে, আজ আর তার কোনও মূল্য নেই, ব্যর্থ তার এতদিনের প্রেতদেহ ধারণ, ব্যর্থ তার সমস্ত সাধন।

কিন্তু কই, তার বুকে তবু কই ঝলসে ওঠে ব্যর্থতার তীব্র জ্বালা? তার চোখে আজ এত জল কেন? এই ছাইয়ের মানুষের চোখে এত জল আসে কোথা থেকে? কই তার বুকের মধ্যে দেড়শো বছর ধরে জ্বালিয়ে রাখা প্রতিশোধের আগুন? সেখানে আজ কেন থৈ থৈ করে অযোধ্যা পাহাড়ের শতঝর্ণার জল? এত ভালোবাসা কোথা থেকে জুড়ে বসল তার অলৌকিক শরীরে? এত মায়া কী করে বাসা বাঁধে তার অন্ধ দু'চোখের কোটরে?

আকাশের দিকে দুটো হাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে তুলে ধরে সে, ঠাকুর শুনেছিলেন তার কথা। রূপাই মরে নাই, মরে নাই। বেঁচে ছিল, বেঁচে ছিলো তার কলজে-ছেঁড়া ধন। আজ নিজের চোখে দেখে এসেছে সে, দু'চোখ ভরে দেখে এসেছে তার রক্তের উত্তরাধিকারীকে। আহা একটিবার যদি তার মুখখানি ধরে চুমো খেতে পারতো সে। আয় রে আমার রূপাই, আয় রে আমার লখাই... তোরা আয় আয় আয়..

নিভে যাওয়া অন্ধ চোখ থেকে নোনতা জল বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দেয় সেই ছাইপোড়া বুক। আহ, বুকের মধ্যিখানে বড় ঠান্ডা, বড় শীতল লাগে তার। দু'হাত তুলে প্রার্থনা করে সে, হো ঠাকুর, আমারে রূপাইয়ের কোল্যে ফির্‌রে দাও ঠাকুর, গোড় লাগি তর পাঁয়্যে।

আস্তে-আস্তে তার মাথা থেকে উড়ে যেতে থাকে সেই ছাইয়ের কণা, প্রথমে ধীরে, তারপর দ্রুত। ভোরের আকাশে উড়ে যেতে থাকে তার ক্রোধ আর অভিমান, উড়ে যেতে থাকে তার পাপ ও পুণ্য, উড়ে যেতে থাকে তার ক্ষোভ আর ঘৃণা।

দাঁড়িয়ে থাকে লোকটা, আর আস্তে-আস্তে জঙ্গলের মানুষের দেহের শেষ কণাটুকু মিশে যায় জঙ্গলের শীতল বাতাসে, মিশে যায় অগণন নক্ষত্রমালায়, মিশে যায় অনন্ত নীহারিকাপুঞ্জে।

ভোরের শীতল বাতাসে কে যেন ফিসফিস করে বলে যায়, বুকে বড় মায়া হে, বড় মায়া! ●

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
অনুষ্টুপ শেঠ, সোহিনী দেবরায়, ঋষা ভট্টাচার্য
রাজা ভট্টাচার্য ও ঋজু গাঙ্গুলী